রবীন্দ্র-কাব্যে ত্রয়ী-পরিকল্পনা

শ্রীসরসীলাল সরকার
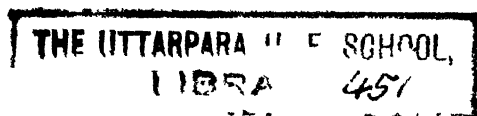
প্রাপ্তিস্থান :
বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়
২, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা

প্রকাশক—শ্রীকানাইলাল সরকার
১৭৭, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা

প্রথম সংস্করণ—আশ্বিন, ১৩৪৮

মূল্য এক টাকা

মুদ্রাকর—শ্রীগঙ্গানারায়ণ ভট্টাচার্য
তাপসী প্রেস, ৩০, কর্নওআলিস স্ট্রীট, কলিকাতা

রবীন্দ্র-কাব্যে ত্রয়ী পরিকল্পনা

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের অনেক কবিতার একটি বিশেষত্ব আমার চোখে পড়িয়াছিল, সে বিশেষত্বটি এই যে, তাঁহার অনেক কবিতাতেই প্রথমে তাল, পরে গান ও তাহার পর গতির ইঙ্গিত পর পর আছে। যেমন—

ছোট ছোট ঢেউ ওঠে আর পড়ে,
রবির কিরণ ঝিকিমিকি করে,
আকাশেতে পাখি, চলে যায় ডাকি
বায়ু বহে যায় ধীরে।

অন্যত্র—

ভাঙ্, ভাঙ্, ভাঙ্ কারা,
আঘাতে আঘাত কর্,
ওরে, কী গান গেয়েছে পাখি
এসেছে রবির কর।

এই উদ্ধৃতাংশ দুইটির প্রথমটিতে "ওঠে আর পড়ে" কথাটির ভিতর ঢেউয়ের উত্থান-পতনের তাল আমরা সুস্পষ্ট ভাবে পাই; তাহার পর আকাশে পাখি ডাকিয়া চলিয়া যাইতেছে তাহাতে গানের ইঙ্গিত এবং পরিশেষে বায়ু বহিয়া যাওয়ায় গতির ইঙ্গিত রহিয়াছে।

"ভাঙ্ ভাঙ্ ভাঙ্ কারা, আঘাতে আঘাত কর্" এই দুটি ছত্রে তালের ইঙ্গিত, তৃতীয় ছত্রে পাখির গানে গানের ইঙ্গিত ও শেষ ছত্রে রবিকরের আগমনে গতির ইঙ্গিত পাওয়া যাইতেছে।

কবির বহু কবিতায় এইরূপ পর পর তাল, গান ও গতির ইঙ্গিত আছে। আমি এই সম্বন্ধে মনস্তত্ত্বের দিক দিয়া আলোচনা করিয়া একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম, সেটি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

হইতে প্রকাশিত CALCUTTA REVIEW মাসিক পত্রে "A PECULIARITY IN DR. RABINDRANATH TAGORE'S POEMS" অর্থাৎ "রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতার পরিকল্পনার একটি বিশেষত্ব" এই নামে ১৯২৮ সালে প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের কবিতা হইতে পর পর তাল, গান ও গতির অনেকগুলি দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছিল। প্রবন্ধটি প্রকাশের পূর্ব্বে যখন আমি কবিকে প্রবন্ধটি শুনাইবার জন্য ও প্রকাশের অনুমতি লাভের জন্য শান্তিনিকেতনে গিয়াছিলাম, তখন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম যে তিনি তাঁহার কবিতার এই তাল-গান-গতির ত্রয়ী পরিকল্পনা স্বীকার করেন কি না? তাহাতে তিনি উত্তর দিয়াছিলেন "তুমি যখন এতগুলো নজীর সংগ্রহ করেছ তখন আমি আর অস্বীকার করি কেমন করে?"

Symbol বা বিগ্রহ

রবীন্দ্রনাথের কবিতা কি ভাবে অবচেতন মন হইতে প্রতীক (symbol) অবলম্বন করিয়া স্ফুরিত হইয়াছে আমার প্রবন্ধে সে-সম্বন্ধে মনস্তত্ত্বের দিক দিয়া আলোচনা ছিল; কবি এ-বিষয়ে আমাকে বলিয়াছিলেন, "তুমি যে লিখিয়াছ অবচেতন মন হইতে আমার কবিতা লেখা হয় সে-কথাটা ঠিক, কেননা আমি ভাবিয়া-চিন্তিয়া চেষ্টা করিয়া কবিতা লিখি না। তবে অবচেতন মনের মধ্যে যে-সকল প্রতীকের সৃষ্টি হয় তাহাদের যে একই অর্থ থাকে এমন নয়, সুতরাং তুমি যে-ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছ তাহাও হইতে পারে, আবার তাহার অন্য ব্যাখ্যাও হইতে পারে।"

প্রতীক বা Symbol সম্বন্ধে অজিতকুমার চক্রবর্তী তাঁহার 'কাব্যপরিক্রমা' গ্রন্থে লিখিয়াছেন,—

"কতকগুলি রস—যাহা কাব্যের বিষয়ীভূত বলিয়া নির্দিষ্ট আছে—তাহাদের সম্বন্ধে আমরা নিশ্চিন্ত আছি, কিন্তু সেই রসগুলির মধ্যেই যে মানুষের সমস্ত হৃদয়াবেগের প্রকাশ নিঃশেষিত হয় তাহা নহে; প্রেম, ভক্তি, করুণা, সৌন্দর্যবোধ প্রভৃতি হৃদয়বৃত্তি যে রসোদ্রেক করে তাহার ধারণা আমাদের মনে সুস্পষ্ট, কিন্তু অনন্তের জন্য পিপাসা যে রসকে জাগায় তাহার ধারণা তো এমন স্পষ্ট নহে; কারণ সেই বিশেষ অনুভূতিটিই কোনো নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে ধরা দেয় না, সেই কারণে তাহা ভাষায় প্রকাশ করা যখন কঠিন হয় তখন তাহা প্রকাশের জন্য symbol বা বিগ্রহকে আশ্রয় করিতে হয়, অর্থাৎ ইঙ্গিত-ইশারায় সেই রসের খানিকটা আভাস দিতে হয়।"

অজিতকুমারের এই উক্তি হইতে আমরা মনস্তত্ত্বের দিক দিয়া এই তথ্যটি পাই যে symbol বা বিগ্রহকে আশ্রয় করিয়া যে রস ইশারা-ইঙ্গিতে আপনাকে অভিব্যক্ত করে, মনের গভীরতম প্রদেশের এমন এক রহস্য তাহার উৎস-স্বরূপ যাহা অনির্বচনীয়। বাক্য যাহা ব্যক্ত করিতে সমর্থ হয় না, এই ইশারা-ইঙ্গিত সেই বচনাতীত ভাবকে ব্যক্ত করিবার জন্য যেন স্বত আবির্ভূত হয়। সীমার মধ্যে অসীমের প্রকাশই রবীন্দ্রনাথের কবিতার অপরূপত্ব; অজিতকুমার বলিয়াছেন কোনো বিগ্রহের আশ্রয় ভিন্ন সে ইঙ্গিত প্রকাশ করা সম্ভব নয়, সুতরাং কবিকে প্রতীকের আশ্রয় লইতে হইয়াছে। কিন্তু এই প্রতীকাশ্রয়, ইহা কবির চেষ্টাকৃত নয়, তাঁহার গভীর অবচেতন মনে আপনা হইতেই বিচিত্র প্রতীকের সৃষ্টি হইতেছে এবং কবিতারূপে ফুটিয়া উঠিতেছে।

পর পর তাল, গান ও গতির ইঙ্গিত

যে ভাষার মধ্য দিয়া এই প্রতীকগুলি স্ফুরিত হইতেছে সেই ভাষারও একটি স্বতঃস্ফূর্ত বিশেষ ভঙ্গী লক্ষ্য করিলে প্রায় সর্বত্রই ধরিতে পারা যায় যে, ভঙ্গীটি আগে তাল, পরে গান ও তাহার পরে গতির ইঙ্গিতরূপে প্রকাশ পাইয়াছে। এই ভঙ্গীটি বুঝাইবার জন্য কতকগুলি কবিতাংশ উদ্ধৃত করিতেছি।

নাচে আলো নাচে, ও ভাই
আমার প্রাণের কাছে,
বাজে আলো বাজে, ও ভাই
হৃদয়-বীণার মাঝে।
জাগে আকাশ, ছোটে বাতাস,
হাসে সকল ধরা।

পিছনে ঝরিছে ঝর ঝর জল
গুরু গুরু দেয়া ডাকে,
মুখে এসে পড়ে অরুণ-কিরণ
ছিন্ন মেঘের ফাঁকে।

বৃথা কেন হুলুধ্বনি,
বৃথা কেন বেজে ওঠে শাঁখ,
বাঁধা আঁচল খুলে ফেল বর—
এসেছে ঐ মৃত্যুপথের ডাক।

সে-কথার সাথে রেখে রেখে মিল
থেকে থেকে ডেকে উঠিবে কোকিল,
কানাকানি করে ভেসে যাবে মেঘ
আকাশ গায়।

উচ্ছল জল করে ছল ছল,
জাগিয়া উঠিছে কলকোলাহল,
তরণী পতাকা চল-চঞ্চল···

তোমার ঝাউয়ের দোলে
মর্মরিয়া ওঠে আমার দুঃখরাতের গান।
পূর্ণিমা-সন্ধ্যায়—
তোমার রজনীগন্ধায়
রূপ-সাগরের পারের পানে উদাসী মন ধায়।

আম্রকাননে ধরেছে মুকুল, ঝরিছে পথের পাশে,
গুঞ্জনস্বরে দু-একটি করে মৌমাছি উড়ে আসে।

ঝিকি ঝিকি করি কাঁপিতেছে বট,
ওগো ঘাটে আয়, নিয়ে আয় ঘট,
পথের দু-ধারে শাখে শাখে আজি পাখিরা গায়;
ভোর থেকে আজ বাদল ছুটেছে, আয় গো আয়।

রক্তে তোমার দুলবে না কি প্রাণ?
গাইবে না কি মরণজয়ী গান?
আকাঙ্ক্ষা তোর বন্যাবেগের মত
ছুটবে না কি বিপুল ভবিষ্যতে?

উঠবে রে ঝড় দুলবে রে বুক
জাগবে হাহাকার,
হালের কাছে মাঝি আছে
করবে নদী পার।

নূপুরে নূপুরে দ্রুত তালে তালে
নদীজলতলে বাজিল শিলা,

ভগবান ভানু রক্তনয়নে
হেরিলা নিলাজ নিঠুর লীলা ।

মর্ম্মরিয়া কাঁপে পাতা
কোকিল কোথা ডাকে,
বাব্‌লা ফুলের গন্ধ ছোটে
পল্লীপথের বাঁকে ।

দুকূল বহিয়া উঠে পড়ে ঢেউ
দর দর বেগে জলে পড়ি জল
ছল ছল উঠে বাজি রে,
খেয়া-পারাপার বন্ধ হয়েছে আজি রে ।

গুরু গুরু মেঘ গুমরি গুমরি
গরজে গগনে গগনে,—
গরজে গগনে,
ধেয়ে চলে আসে বাদলের ধারা ।

বাজুক কাকন আমার হাতে
তোমার গানের তালের সাথে,
যেমন নদীর ছল ছল জলে
ঝরে ঝর ঝর শ্রাবণ-ধারা ।

কি কথা উঠে মর্ম্মরিয়া বকুলতরুপল্লবে
ভ্রমর উঠে গুঞ্জরিয়া কি ভাষা,
ঊর্দ্ধমুখে সূর্য্যমুখী স্মরিছে কোন্ বল্লভে
নির্ঝরিণী বহিছে কোন্ পিপাসা ।

শুনেছিনু যেন মৃদু রিনি রিনি
ক্ষীণ কটি ঘেরি বাজে কিঙ্কিণী

পেয়েছিনু যেন ছায়াপথে যেতে
তব নিঃশ্বাস-পরিমল।

ডুলই কুসুমমঞ্জরী
ভ্রমর ফিরই গুঞ্জরী
অলস যমুনা বহিয়া যায়
ললিত গীত গাহি রে।

তুমি এমনি কি ধীরে দিবে দোল
মোর অবশ বক্ষ-শোণিতে ?
কানে বাজাবে ঘুমের কলরোল
তব কিঙ্কিনী রণ-রণিতে।
শেষে পসারিয়া তব হিমকোল
মোরে স্বপনে করিবে হরণ।

জলের ঢেউ তরল তানে
সে ছায়া লয়ে মাতিল গানে
ঘিরিয়া তারে ফিরিব তরী বাহি রে।

তরণী কাঁপিছে থর থর—
তীরের সঞ্চয় তোর পড়ে থাক্ তীরে
তাকাস নে ফিরে,
সম্মুখের বাণী
নিক্ তোরে টানি
মহাস্রোতে।

কাঁপছে দেহে কাঁপছে মনে, হাওয়ার সাথে আলোর সনে
মর্মরিয়া উঠছে কলতান।
কোন্ অতিথি এসেছে গো, কারেও আমি চিনিনে গো
মোর দ্বারে কে করছে আনাগোনা।

হয়তো কোনো কবিতার প্রথম স্তবকে তালের, দ্বিতীয় স্তবকে গানের এবং তৃতীয় স্তবকে গতির পরিকল্পনা আছে। যেমন—

ঘন শ্রাবণ মেঘের মতো
রসের ভারে নম্র নত
একটি নমস্কারে প্রভু
একটি নমস্কারে
সমস্ত মন পড়িয়া থাক
তব ভবন-দ্বারে।

নানা সুরের আকুল ধারা
মিলিয়ে দিয়ে আত্মহারা
একটি নমস্কারে প্রভু
একটি নমস্কারে
সমস্ত গান সমাপ্ত হোক
নীরব পারাবারে।

হংস যেমন মানসযাত্রী
তেমনি সারা দিবস-রাত্রি
একটি নমস্কারে প্রভু
একটি নমস্কারে
সমস্ত প্রাণ উড়ে চলুক
মহামরণপারে।

এই কবিতাটির প্রথম স্তবকে "ঘন শ্রাবণ মেঘের মত, রসের ভারে নম্র নত" এই দুই ছত্রে সজল বর্ষণোন্মুখ মেঘের বর্ণনাতেই আমাদের প্রাণে বর্ষণের তালের ছন্দ আসিয়া পড়ে। অপর দুটি স্তবকে গান ও গতি আছে।

নিম্নে আর একটি কবিতা উদ্ধৃত করিতেছি, ইহাতেও পর পর স্তবকে তাল, গান ও গতি আছে।

খর কণ্টকে ছিন্ন চরণ,—
ধূলায় রৌদ্রে মলিন বরণ,
আশেপাশে হ'তে তাকায় মরণ
সহসা লাগায় ভ্রম।

তারি মাঝে বাঁশি বাজিছে কোথায়
কাঁপিছে বক্ষ সুখের ব্যথায়
তীব্র তপ্ত দীপ্ত নেশায়
চিত্ত মাতিয়া ওঠে।

কোথা হ'তে আসে ঘন সুগন্ধ,
কোথা হ'তে বায়ু বহে আনন্দ,
চিন্তা ত্যজিয়া পরাণ অন্ধ
মৃত্যুর মুখে ছোটে।

পর-পর স্তবকে ত্রয়ী-পরিকল্পনার আর একটি দৃষ্টান্ত—

তটের পায়ে মাথা কুটে
তরঙ্গদল ফেনিয়ে উঠে
গিরির পাদমূলে,
ঐখানে ঐ মেঘের বাণী
জড়িয়ে আছে বনের শ্রেণী
মর্মরিছে নারিকেলের শাখা
গরুড় সম ঐ যেখানে
উর্দ্ধশিরে গগন পানে
শৈলমালা তুলেছে নীল পাখা।

এই প্রবন্ধের পরিশিষ্টে ত্রয়ী-পরিকল্পনার আরও উদাহরণ সংগৃহীত হইয়াছে।

স্বপ্নের ছবির সহিত কবির কবিতার ছবির মিল

পর পর তাল, গান ও গতির পরিকল্পনার ভিতর দিয়া কখনো অতি স্পষ্ট কখনো বা অস্পষ্ট ভাবে যে একটি প্রতীক ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহার ভিতরের ভাবটি ধরিতে হইলে প্রথমে স্বপ্নচৈতন্য সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা আবশ্যক। রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ কবিতা এবং অনেক গল্পরচনা চিত্রধর্মী, আমাদের সম্মুখে যেন একটি ছবি আঁকিয়া দিয়া যায়। সে-ছবিটি ঠিক বাস্তব জগতের ছবি নয়, অথচ তাহার মধ্যে এমন একটি গভীর ভাব প্রচ্ছন্ন আছে, যাহা আমাদের মনের অনুভূতিতে স্পর্শ করিয়া জাগাইয়া দিয়া যায়। বাক্যার্থের দিক দিয়া তাহার ঠিক অর্থটি ধরা না গেলেও তাহার মধ্যে যে একটি গভীর ভাব প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে সে-কথা আমরা অনুভব করি।

স্নিগ্ধ শ্যাম পত্রপুটে
আলোক ঝলকি উঠে
পুলক নাচিছে গাছে গাছে।

এই কয় ছত্রে পুলক যেন আলোক-রূপে গাছে গাছে নৃত্য করিতেছে কবি এইরূপ একটি ছবি আঁকিয়াছেন। ইহা বাস্তব জগতের চিত্র হইতে পারে না, ইহা একটি স্বপ্নের ছবি।

অন্যত্র—

নীল আকাশের সোনার আলোয়
কচি পাতার নূপুর বাজে।

ইহাও একটি স্বপ্নচিত্র।

সহসা শুনিনু সেই ক্ষণে
সন্ধ্যার গগনে

শব্দের বিদ্যুৎচ্ছটা শূন্যের প্রান্তরে
মুহূর্তে ছুটিয়া গেল দূর হ'তে দূরে দূরান্তরে।
হে হংসবলাকা,
ঝঞ্ঝামদরসে মত্ত তোমাদের পাখা
রাশি রাশি আনন্দের অট্টহাসে
বিস্ময়ের জাগরণ তরঙ্গিয়া চলিল আকাশে।

এই কবিতা স্তবকদুটিও স্বপ্নচিত্র।

প্রথম-উদ্ধৃত কবিতায় পুলককে আলোকের সহিত সমান (identification) করা হইয়াছে। এই যে সমান করার দৃষ্টান্ত এই স্থানে দেওয়া হইল, মনোবিজ্ঞানের ভাষায় ইহাকে Identification Process আখ্যা দেওয়া হয়। দ্বিতীয় কবিতাটিতে কচি পাতার বাতাসে আন্দোলনকে নূপুরধ্বনির সহিত সমান করা হইয়াছে এবং পরবর্তী কবিতা স্তবক দুটির একটিতে শব্দকে বিদ্যুৎছটার সঙ্গে সমান করা হইয়াছে এবং অপর স্তবকে পাখার ধ্বনিকে আনন্দের অট্টহাস্যের সহিত সমান করা হইয়াছে।

কেন এমন হইল? ইহা যে কবি উপমাস্বরূপ ব্যবহার করিয়াছেন তাহা নয়, স্বপ্নে যেমন দুইটি ছবি মিলিয়া এক হইয়া যায় ইহা যেন ঠিক সেইরূপ ভাবে দুইয়ে মিলিয়া এক হইয়া গিয়াছে। ইহাকে Condensation Process বলা হয়। যেমন, স্বপ্নে আমরা এক জনের ছবি দেখিলাম, আবার মনে হইল যে সে যেন অন্য এক জনের মুখের ছবি। স্বপ্নে রামের মুখের ছবি দেখিলাম, আবার সেই ছবিকেই শ্যামের মুখের ছবি মনে হইল। এরূপ ক্ষেত্রে বুঝিতে হইবে রাম সম্বন্ধে স্বপ্নদ্রষ্টার যাহা ধারণা এবং শ্যাম সম্বন্ধে

যাহা ধারণা উভয়ই এখানে আছে এবং একইরূপে প্রকাশ পাইতেছে। কবির বহু কবিতাতেই এইরূপ আছে।

ওরে শিরীষ ওরে শিরীষ
মৃদু হাসির অন্তরালে
গন্ধজালে শূন্য ঘিরিস,
তোমার গন্ধ আমার কণ্ঠে
আমার হৃদয় টেনে আনে।

এখানে হাসি ও গন্ধকে সমান করা হইয়াছে, আবার এই গন্ধকে কবির নিজের গানের সহিতও সমান করা হইয়াছে।

তাল, গান ও গতির পরিকল্পনার নানা রূপ

এই জন্য রবীন্দ্রনাথের কবিতায় যে পর পর তাল গান ও গতির পরিকল্পনা আছে তাহাও নানা রূপ ধারণ করিয়া প্রকাশ পাইয়াছে। যাহাতে সহজ ভাবে তালের ধারণা হয় সেইরূপ শব্দই যে তালের পরিকল্পনায় সর্বত্র ব্যবহৃত হইয়াছে তাহা নয়। তালের পরিকল্পনায় কিছুক্ষণ পর পর অথচ যেন ছন্দ রাখিয়া একটি ঘটনা ঘটিতেছে, যেমন—দোলন, কম্পন, অশ্রু, বৃষ্টি, শিশির, আম্রমুকুল প্রভৃতির ঝর ঝর করিয়া ঝরিয়া পড়া, তালে তালে শব্দ, ওঠাপড়া, ঢেউয়ের নৃত্য, জলের ছল ছল কল কল শব্দ বা তালে তালে গতির দ্বারা তালের ইঙ্গিত বুঝায়। তালের ইঙ্গিত সম্বন্ধে আরো একটি বিশেষ কথা এই যে, বিক্ষেপের ভিতর একটি সামঞ্জস্য, শৃঙ্খলা ও সুনিয়ম তালের দ্বারা সূচিত হইয়াছে।

গানের পরিকল্পনায় গান, পাখির ডাক, মৌমাছির গুঞ্জন, ঝিল্লীর ধ্বনি, বাজনা, হাসি, নদীর কল্লোল, মেঘগর্জন, হাহাকার,

বাতাসের শব্দ, কলভাষ, কোলাহল ও রোদন প্রভৃতিতে গানের ইঙ্গিত প্রকাশিত হইয়াছে। কখনও বা শঙ্খধ্বনি, নূপুরশিঞ্জন, শিশুর কানে জননীর রূপকথার গুঞ্জনও গানের ইঙ্গিতরূপে প্রকাশিত হইয়াছে।

গতির পরিকল্পনায় যাওয়া-আসা ছাড়া অন্য নানাভাবেও গতির ইঙ্গিত হইয়াছে। বিদ্যুৎ, অশ্রুধারায় গলিয়া পড়া, খেয়া-পারাপার প্রভৃতিতেও গতির ইঙ্গিত আছে।

পর পর তাল, গান ও গতির ব্যাখ্যার সময় এই ইঙ্গিতের বিষয় বিস্তারিত করিয়া বলা যাইবে। তবে এখানে এ-কথা উল্লেখ-যোগ্য যে, স্বপ্নচৈতন্যের সহিত সংস্রব থাকাতেই এইরূপ ভাবে তাল, গান ও গতির ইঙ্গিতগুলি নানারূপ ধারণ করিয়া প্রকাশ পাইয়াছে।

স্বপ্নচৈতন্যের সহিত কবির কবিতার বিশেষ সম্পর্ক

স্বপ্নচৈতন্যের সহিত কবির কবিতার যে বিশেষ সম্বন্ধ আছে তাঁহার রচনায় সর্বত্রই তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার হংস-বলাকার পক্ষধ্বনি "ঝঞ্ঝা-মদরসে মত্ত"—ইহাতে গানের পরিকল্পনা দেখা যাইতেছে। কখনও বা কবি গানকে "সুরের আবীর হানব হাওয়ায়" "আমার মনের রাগরাগিণী রাঙা হল রঙীন তানে" বলিয়া বর্ণরাগে রঞ্জিত করিয়াছেন। 'অরুণবীণা সে সুর দিল রণিয়া' 'রঙের ঢেউ রসের স্রোতে মাতিয়া উঠে সঘনে" প্রভৃতিতেও এই রঞ্জন দেখিতে পাই। এইগুলি সমস্তই স্বপ্নের ছবি।

মনস্তাত্ত্বিকদের মতে অবচেতন মনের স্তর হইতে স্বপ্নচৈতন্যের উদ্ভব হয়।

কবির অবচেতন গভীর মনে যে-সমস্ত বিচিত্র অনুভূতি জাগিয়া উঠিত তাহাই স্বপ্নচৈতন্যের ছবিরূপে তাঁহার কবিতায় প্রস্ফুটিত হইয়াছে। কবি তাঁহার "বিচিত্রা" কবিতায় সে-সম্বন্ধে এইভাবে আমাদের ইঙ্গিত দিয়াছেন—

চোরাই করে' এনেছ মোরে তুমি
বিচিত্রা, হে বিচিত্রা,
যেখানে তব রঙের রঙ্গভূমি।
আকাশতলে এলায়ে কেশ
বাজালে বাঁশি চুপে,
সে মায়াসুরে স্বপ্নছবি
জাগিল কতরূপে।

কবির অনেক কবিতাতেই এই ভাবে স্বপ্নচৈতন্যের উল্লেখ আছে। এই স্বপ্নচেতনার অনুভূতিতেই তিনি প্রকৃতির মধ্যে জীবনের বিচিত্রলীলা প্রত্যক্ষ অনুভব করিয়া প্রকৃতির সহিত এক অপূর্ব আত্মীয়তার অনুভূতি লাভ করিয়াছিলেন। আবার এই স্বপ্নচৈতন্যের মধ্য দিয়াই তিনি মানবহৃদয়ের গূঢ় রহস্যময় রাজ্যের সন্ধান পাইয়াছেন। এই স্বপ্নচেতনাই তাঁহাকে অজানা দেশের সন্ধান দিয়াছে, তাঁহার অবচেতন গভীর মনের তন্ত্রীতে সীমার মধ্যে অসীমের সুরও ঝংকৃত করিয়াছে। এখানে মনে প্রশ্ন জাগে এই স্বপ্নচৈতন্য কি, তাহার ক্রিয়াই বা কিরূপ ?

স্বপ্নচৈতন্যের দুইটি স্তর

মনস্তাত্ত্বিক বলেন, জীবনের বাস্তব ঘটনাসমূহের চিত্র অবলম্বন করিয়াই স্বপ্নচিত্রের সৃষ্টি হয়। স্বপ্নের সময় আমাদের গভীর অবচেতন মনের কোনো গূঢ় ভাবকে কেন্দ্র করিয়া বাস্তব

জীবনের ঘটনাবলীর অবলম্বনে স্বপ্নচিত্রের সৃষ্টি হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, স্বপ্নচিত্রের দুইটি স্তর আছে। একটি তাহার ভিতরের গূঢ় ভাব যাহাকে latent content বা মর্মকথা বলা হয়, আর একটি এই গূঢ়ভাবের বহিরাবরণ স্বরূপ দৃশ্যের ছবি যাহাকে manifest content বলা হয়। এই manifest content বা বাহিরের দৃশ্যের অন্তরালে স্বপ্নের নিগূঢ় ভাবটি প্রচ্ছন্ন থাকে।

স্বপ্নের ভিতর প্রতীক

স্বপ্নের মধ্যে প্রায়ই symbol বা বিগ্রহ অর্থাৎ এমন কোনো ছবি থাকে যাহার ভিতর গূঢ় অর্থ প্রচ্ছন্ন আছে। অর্থাৎ সেই ছবিটিকে বাহিরের দৃষ্টিতে যাহা মনে হইতেছে বা যে-ভাবের প্রকাশক বলিয়া মনে হইতেছে প্রকৃতপক্ষে সেই বস্তুটি বুঝানো বা সেই ভাবটি প্রকাশ করা এই ছবির যথার্থ উদ্দেশ্য নয়; স্বপ্নের যেমন manifest content অর্থাৎ বাহিরের দৃশ্যের স্তর এবং ভিতরের গূঢ়ভাবব্যঞ্জক স্তর বা latent content আছে, স্বপ্নের মধ্যে যে-সকল symbol থাকে তাহাদেরও সেইরূপ বাহিরের আকৃতি ও ভিতরের প্রচ্ছন্ন গূঢ়ভাব উভয়ই থাকে। manifest content এবং symbolএ প্রভেদ এই যে, manifest content নানাপ্রকারের হইতে পারে, এবং তাহাদের গূঢ়ভাব বা latent contentও নানাপ্রকার হয়; কিন্তু symbol বা প্রতীকের বেলায় এক শ্রেণীর অর্থাৎ এক নির্দিষ্ট আকৃতির প্রতীকের মধ্যে একই রূপ গূঢ়ভাব থাকে।

পর পর তাল, গান ও গতির পরিকল্পনা কবির কবিতায় প্রতীক স্বরূপ স্বতঃস্ফুরিত হইয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের কবিতাকে স্বপ্নচিত্র বলিয়া গ্রহণ করিলে, ইহার ভিতর প্রায় সর্বত্রই এইরূপ পর পর তাল, গান ও গতির পরিকল্পনা কেন আছে তাহার তাৎপর্য আমাদের নিকট পরিস্ফুট হওয়া আবশ্যক। স্বপ্নের ভিতর যেমন প্রতীক থাকে, এই পর পর তাল, গান এবং গতিও সেইরূপ কবির কবিতার ভিতর প্রতীক স্বরূপ রহিয়াছে এবং এই প্রতীকের একটি গূঢ় তাৎপর্য আছে। সেই গূঢ় অর্থটি আবিষ্কার করিতে হইলে, যে-উপায়ে স্বপ্নচিত্রের প্রতীকের অর্থ আবিষ্কারের চেষ্টা করা হয়, কবির কবিতার এই তাল, গান ও গতির পরিকল্পনারূপ প্রতীকের গূঢ় তাৎপর্য আবিষ্কারের জন্যও সেইভাবেই চেষ্টা করিতে হইবে।

পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, রবীন্দ্র-কাব্যে তাল, গান ও গতির পরিকল্পনা সম্বন্ধে আমার প্রবন্ধটি CALCUTTA REVIEWতে প্রকাশের পূর্বে রবীন্দ্রনাথকে দেখাইলে তিনি আমাকে বলেন, "অবচেতন মনের মধ্যে যে-সকল প্রতীক সৃষ্টি হয় সেগুলির ভিতর যে একই অর্থ থাকে এমন নয়। সেজন্য তুমি যে-ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছ তাহাও হইতে পারে আবার অন্যরকম ব্যাখ্যাও হইতে পারে।"

কবির এই উক্তি সম্পূর্ণ সত্য। একটি কথার অর্থ যেমন অপর একটি কথার দ্বারা প্রকাশ করা যায়, symbolএর অর্থ ঠিক ঐরূপ ভাবে প্রকাশ করা যায় না। প্রতীকের অর্থ একটি ভাবকে কেন্দ্র করিয়া গঠিত হয় এবং একটি ভাবের গণ্ডীর মধ্যে নিবদ্ধ থাকে, কিন্তু তাহার বাহিরের রূপ নানা বিভিন্ন ভাবে প্রকাশ পাইতে

পারে, কেননা যে-ভাবকে কেন্দ্র করিয়া প্রতীক গঠিত হয় তাহা আমাদের জ্ঞানময় স্তরের ভাব নয়। প্রতীকের রূপের যে এইরূপ বিভিন্নতা হয়, তাহা তাল, গান ও গতির বিভিন্নরূপে প্রকাশের দ্বারাই বুঝা যায়। প্রতীকের ভিতরের latent content ঠিক এক ধরণের না হইলেও গূঢ় ভাবের দিক দিয়া মূলতঃ একই হয়, তবে সেটি ঠিকভাবে ধরিতে না পারায় অন্যরকম ব্যাখ্যাও হইতে পারে। সুতরাং পর পর তাল, গান ও গতির পরিকল্পনার ব্যাখ্যার এই প্রয়াসকে নির্ভুল বলিয়া আমরা দাবী করিতে পারি না।

"সোনার তরী" কবিতার Latent Content

ঘুমের আঁধার কোটরতলে স্বপ্নপাখির বাসা
কুড়ায়ে এনেছে মুখরদিনের খসে-পড়া ভাঙা ভাষা।

স্বপ্ন কিরূপে সৃষ্টি হয় এই কবিতায় তাহারই ইঙ্গিত আছে। মুখরদিনের বাস্তব জীবনের ঘটনা লইয়া স্বপ্নের সৃষ্টি হয়, রবীন্দ্রনাথের এই উক্তিটি মনোবিজ্ঞানের কথা।

স্বপ্ন কিরূপে দেখে কবি এই কবিতায় তাহার যেমন ইঙ্গিত দিয়াছেন তাঁহার কবিতার স্বপ্নচিত্রগুলি সৃষ্টিরও তেমনি ইঙ্গিত দিয়াছেন। এই সকল কবিতার স্বপ্নচিত্রের প্রকৃত তাৎপর্য বুঝা যে খুব সহজ তাহা নয়। "সোনার তরী" কবিতাটি একটি স্বপ্নচিত্র। ইহার তাৎপর্য লইয়া এক সময় বহু বাদপ্রতিবাদ হইয়াছিল (প্রবাসী, ১৩১৩)। অনেকে এই কবিতাটিকে "অর্থহীন" বলিয়া মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। দ্বিজেন্দ্রলাল রায় লিখিয়াছিলেন যে, রবীন্দ্রনাথের এক শ্রেণীর কবিতা এত অস্পষ্ট, দুর্বোধ্য ও

জটিল যে, তাহাতে সাহিত্যরস খুঁজিয়াই পাওয়া যায় না। দুর্বোধ্য কবিতার দৃষ্টান্ত স্বরূপ তিনি "সোনার তরী" কবিতার উল্লেখ করিয়াছিলেন।

বহু বাদপ্রতিবাদের পর রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং ইহার তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়া তর্কের মীমাংসা করিয়া দিয়াছেন। "সোনার তরী" সকল পাঠকের নিকট সহজবোধ্য হয় নাই এই কারণেই যে, ইহার বাহিরে যে-ছবি আছে তাহা হইতে ইহার latent content বুঝিয়া লওয়া সকলের পক্ষে সম্ভব হয় নাই। ইহার বাহিরের ছবি বা manifest content এইরূপ: কবি যখন নৌকায় করিয়া পদ্মা নদীতে ভ্রমণ করিতেছিলেন তখন বর্ষার এক অপরাহ্নে কাঁচা ধানে ডিঙিনৌকা বোঝাই করিয়া মগ্নপ্রায় চর হইতে খরস্রোতা পদ্মার উপর দিয়া চাষীরা এপারে চলিয়া আসিতেছে, এই দৃশ্য দেখিয়াছিলেন। সেই দৃশ্যটি তাঁহার "ঘুমের আঁধার কোটরতলে" লুকাইয়া ছিল, এবং এক সময়ে একটি গূঢ় ভাবকে কেন্দ্র করিয়া তাহা "সোনার তরী" কবিতারূপে আত্মপ্রকাশ করিল। আমি এক-দিন কবিকে "সোনার তরী" কবিতার মর্ম জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম; তিনি উত্তরে যাহা বলিয়াছিলেন এখানে স্মৃতি হইতে তাহার মূল কথাটি উদ্ধৃত করিতেছি। কবি বলিয়াছিলেন, আদিম যুগ হইতে মানবজাতি পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়া কাজ করিয়া যাইতেছে, সেই কাজগুলিই তাহার জীবনের সঞ্চয় বা ফসল—তাহাদের এই কর্মের দ্বারাই পৃথিবীতে সভ্যতা জ্ঞান প্রভৃতির ক্রমশ বিকাশ হইতেছে। মানব যখন জীবনান্তে পৃথিবী হইতে বিদায় গ্রহণ করে, তখন তাহার এই সব কৃতকর্ম পৃথিবীতে থাকিয়া যায়, কিন্তু যে এই সব কর্ম আরম্ভ করিয়াছিল তাহার নাম পৃথিবী হইতে লুপ্ত

হইয়া যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, আজ মানুষ রন্ধন করিয়া নানারূপ সুখাদ্য পক্কদ্রব্য আহার করিতেছে কিন্তু আদিমকালে মানুষ রন্ধনপ্রণালী জানিত না, তাহারা অপক্কদ্রব্যই ভক্ষণ করিত। যে-সব লোক প্রথম রন্ধনপ্রণালী প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন ও ক্রমশ ইহার উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের নাম পৃথিবী হইতে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু তাঁহাদের আবিষ্কৃত রন্ধনপ্রণালী পৃথিবীতে বহিয়া গিয়াছে।

'শান্তিনিকেতন' সপ্তম খণ্ডে "তবী বোঝাই" শীর্ষক উপদেশেও কবি "সোনাব তরী" কবিতার ব্যাখ্যা করিয়াছেন,

সোনার তরী বলে একটা কবিতা লিখেছিলুম এই উপলক্ষ্যে তাব একটা মানে বলা যেতে পারে।

মানুষ সমস্ত জীবন ধবে ফসল চাষ করছে। তার জীবনের খেতটুকু দ্বীপেব মত—চারিদিকেই অব্যক্তের দ্বারা সে বেষ্টিত—ঐ একটুখানি তার কাছে ব্যক্ত হযে আছে। সেইজন্য গীতা বলেছেন—

অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত।
অব্যক্তনিধনান্যেব তত্র কা পরিবেদনা॥

যখন কাল ঘনিযে আসছে, যখন চারিদিকের জল বেড়ে উঠছে, যখন আবার অব্যক্তের মধ্যে তার ঐ চরটুকু তলিয়ে যাবার সময হল—তখন তার সমস্ত জীবনের কর্মের যা কিছু নিত্য ফল তা সে ঐ সংসারের তরণীতে বোঝাই করে দিতে পারে। সংসার সমস্তই নেবে, একটি কণাও ফেলে দেবে না—কিন্তু যখন মানুষ বলে ঐ সঙ্গে আমাকেও নাও, আমাকেও রাখো, তখন সংসার বলে—তোমার জন্যে জাযগা কোথায? তোমাকে নিযে আমার হবে কি? তোমার জীবনের ফসল যা কিছু রাখবার তা সমস্তই রাখব, কিন্তু তুমি তো রাখবার যোগ্য নও।

প্রত্যেক মানুষ জীবনের কর্মের দ্বারা সংসারকে কিছু না কিছু দান করছে, সংসার তার সমস্তই গ্রহণ করছে, রক্ষা করছে, কিছুই নষ্ট হতে দিচ্ছে না—কিন্তু মানুষ যখন সেই সঙ্গে অহংকেই চিরন্তন করে রাখতে চাচ্ছে, তখন তার চেষ্টা বৃথা

হচ্ছে। এই যে জীবনটি ভোগ করা গেল অহংটিকেই তার খাজনা স্বরূপ মৃত্যুর হাতে দিয়ে হিসাব চুকিয়ে যেতে হবে—ওটি কোনোমতেই জমাবার জিনিস নয়।

রবীন্দ্র-রচনাবলী তৃতীয় খণ্ডে 'সোনার তরী' গ্রন্থের সূচনায় কবি বলিযাছেন,

এই সময়কার প্রথম কাব্যের ফসল ভরা হয়েছিল সোনার তরীতে। তখনই সংশয় প্রকাশ করেছি এ তরী নিঃশেষে আমার ফসল তুলে নেবে কিন্তু আমাকে নেবে কি ?

কবিব এই উক্তি হইতে আমরা "সোনার তরী" কবিতার স্বপ্নচিত্রের **latent content**এর কিছু আভাস পাই। কবির অবচেতন মনের গূঢ় ভাব এই কথাটি তাঁহাকে জানাইয়াছিল যে, সংসার তাঁহাকে ভুলিতে বা ত্যাগ করিতে পারে কিন্তু তরী বোঝাই করিয়া তিনি যে ফসল দিয়াছেন তাহা ত্যাগ করিতে পারিবে না।

'অনাদৃত' কবিতার Latent Content

তাঁহার "অনাদৃত" কবিতার ব্যাখ্যার ভিতরেও এইরূপ একটি **latent content**এর আভাস পাই। এই কবিতাটিও একটি স্বপ্নচিত্র। কবিতাটির ব্যাখ্যা করিতে গিয়া রবীন্দ্রনাথ ছিন্নপত্রের একখানি চিঠিতে বলিয়াছেন,

মনে কর একজন ব্যক্তি তার জীবনের প্রভাতকালে সমুদ্রের ধারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িযে সূর্যোদয় দেখছিল। সে সমুদ্রটা তার আপনার মন কিংবা ঐ বাহিরের বিশ্ব কিংবা উভযের সীমানা-মধ্যবর্তী একটি ভাবের পারাবার সে-কথা স্পষ্ট করে বলা হয় নি। যাই হোক সেই অপূর্ব সৌন্দর্যময় অগাধ সমুদ্রের দিকে চেযে চেয়ে লোকটার মনে হল এই রহস্য-পাথারের মধ্যে জাল ফেলে দেখা যাক না, কি পাওয়া

যায়। এই বলে তো সে ঘুরিয়ে জাল ফেললে। নানারকমের অপরূপ জিনিস উঠতে লাগল—কোনোটা বা হাসির মত শুভ্র, কোনোটা বা অশ্রুর মত উজ্জ্বল, কোনোটা বা লজ্জার মত রাঙা।...সন্ধ্যার সময় মনে করলে এবারকার মত যথেষ্ট হয়েছে, এইগুলি নিয়ে তাকে দিয়ে আসা যাক্ গে। কাকে যে সে-কথাটা স্পষ্ট করে বলা হয় নি—হয়তো তার প্রেয়সীকে, হয়তো তার স্বদেশকে। কিন্তু যাকে দেবে সে তো এ সমস্ত অপূর্ব জিনিস কখনো দেখেনি।...ফলত সমস্ত দিনের জাল ফেলা অগাধ সমুদ্রের এই রত্নগুলি যাকে দেওয়া গেল সে বললে এ আবার কি? জেলেরও মনে তখন অনুতাপ হল, সত্যি বটে, এ তো বিশেষ কিছু নয়, আমি কেবল জাল ফেলেছি আর জাল তুলেছি—আমি তো হাটেও যাই নি. পয়সাকড়িও খরচ করি নি এর জন্যে তো আমাকে কাউকে এক পয়সা খাজনা কিংবা মাশুল দিতে হয় নি। সে তখন কিঞ্চিৎ বিষণ্ণমুখে লজ্জিতভাবে সেগুলি কুড়িয়ে নিয়ে ঘরের দ্বারে বসে একে একে রাস্তায় ফেলে দিলে। তার পরদিন সকালবেলায় পথিকেরা এসে সেই বহুমূল্য জিনিসগুলি দেশে বিদেশে আপন আপন ঘরে নিয়ে গেল। বোধ হচ্ছে এই কবিতাটি যিনি লিখেছেন তিনি মনে করেছেন তাঁর গৃহকার্য-নিরতা অন্তঃপুরবাসিনী জন্মভূমি, তাঁর সমসাময়িক পাঠকমণ্ডলী তাঁর কবিতাগুলির ঠিক ভাবগ্রহ করতে পারবে না, তার যে কতখানি মূল্য সে তাদের জ্ঞানগোচর নয়, অতএব এখনকার মত এ-সমস্ত পথেই ফেলে দেওয়া যাচ্ছে, তোমরাও অবহেলা কর আমিও অবহেলা করি, কিন্তু এ রাত্রি যখন পোহাবে তখন 'পস্টারিটি' এসে এগুলি কুড়িয়ে নিয়ে দেশে বিদেশে চলে যাবে। কিন্তু তাতে ঐ জেলে লোকটার মনের আক্ষেপ কি মিটবে? যাই হোক 'পস্টারিটি' যে অভিসারিণী রমণীর মত দীর্ঘরাত্রি ধরে ধীরে ধীরে কবির দিকে অগ্রসর হচ্ছে এবং হয়তো নিশিশেষে এসে উপস্থিত হতেও পারে এ সুখকল্পনাটুকু কবিকে ভোগ করতে দিতে কারো বোধ হয় আপত্তি না হতেও পারে।

এই বর্ণনার ভিতরে "কিন্তু তাতে ঐ জেলে লোকটার মনের আক্ষেপ কি মিটবে?" এই উক্তির মধ্যে latent contentএর যে আভাস পাওয়া যায় তাহাতে মনে হয় কবির গভীর মনে এইরূপ একটি আক্ষেপ ছিল যে তাঁহার জন্মভূমিতে তাঁহার

সমসাময়িক পাঠকগণের মধ্যে তাঁহার কবিতার প্রকৃত মূল্য কেহ অনুভব করিতে পারে নাই। এই আক্ষেপের সহিত ভবিষ্যতে এবং ভিন্ন দেশে প্রকৃত ভাবগ্রাহীর নিকট কবিতাগুলির যথার্থ আদর হইবে এইরূপ সুখকল্পনাও জড়িত আছে।

এই 'অনাদৃত' কবিতার ব্যাখ্যার ভিতর অন্য একটি **latent content**ও পাওয়া যায়, সেটি এইরূপ: যাহা শ্রেয় বলিয়া লোকে গ্রহণ করে অর্থাৎ যাহাতে পৃথিবীর হিত হয় সেরূপ কর্তব্যসিদ্ধিকে কবি তাঁহার রচনায় প্রাধান্য দেন নাই। তাঁহার কবিতাগুলিকে যদি কেহ সেই দিক দিয়া যাচাই করিতে চায় সেই যাচাইকারের নিকট তাহা অর্পণ করা অপেক্ষা তিনি পথে ফেলিয়া দেওয়া ভালো বলিয়া মনে করেন। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্তকে কবি একখানি চিঠিতে যাহা লিখিয়াছিলেন তাহা এখানে উদ্ধৃত করা যাইতে পারে।

তুমি লিখেছ আমার কাব্যে শ্রেয়োবোধের প্রাধান্য নেই। যদিও তার কোনো কোনো ব্যতিক্রম পাওয়া যায় তবু আমার মনে হল মোটের উপর তোমার কথাটা সত্য।

আমার কাব্যের মধ্যে আমার চিত্তের যে গূঢ় লক্ষ্য দেখা যায় সে কর্তব্যসিদ্ধি অভিমুখে নয়। তাতে দেখতে পাই, কর্মকে অতিক্রম করে' যে অমৃতময় অবকাশ দেবভোগ্য তারই জন্য আমার যথার্থ উৎকণ্ঠা। এই নৈষ্কর্ম্য অক্রিয় নয়। এর গভীরতার মধ্যে যে ক্রিয়া আছে তা স্বাভাবিকী তা সৃষ্টিসংকল্পের সহজ আনন্দে বেগবতী।······যে অসীম অবকাশের মধ্যে চন্দ্রসূর্য গ্রহ তারকার নিরন্তর উদ্যম দীপালি-উৎসবের মত প্রকাশ পেয়েছে, যে অবকাশের মধ্যে ফুল ফুটছে, ফল ফলছে, শস্য উঠছে পেকে তাদের প্রাণের চেষ্টাকে নেপথ্যগত করে, তাদের প্রাণের প্রকাশ বিশ্বের কাছে উৎসৃষ্ট হচ্ছে সেই অন্তর্গূঢ় প্রাণপূর্ণ অবকাশকেই আমার কর্মের মধ্যে আহ্বান করেছি।"—প্রবাসী, অগ্রহায়ণ, ১৩৪১

নির্ঝরিণী কবিতার ব্যাখ্যা

"শেষের কবিতা" উপন্যাসে "নির্ঝরিণী" নামে যে-কবিতাটি আছে কবি নিজে তাহার একটি ব্যাখ্যা আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশ করিয়াছিলেন। নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করা হইল :

নির্ঝরিণী

ঝরণা, তোমার স্ফটিক জলের স্বচ্ছধারা
তাহারি মাঝারে দেখে আপনারে সূর্যতারা।
তারি একধারে আমার ছায়ারে
আনি মাঝে মাঝে দুলায়ো তাহারে,
তারি সাথে তুমি হাসিয়া মিলায়ো কলধ্বনি,
দিয়ো তারে বাণী যে বাণী তোমার চিরন্তনী।

আমার ছায়াতে তোমার ছায়াতে মিলিত ছবি,
তাই নিয়ে আজি পরানে আমার মেতেছে কবি।
পদে পদে তব আলোর ঝলকে
ভাষা প্রাণে আনে পলকে পলকে
মোর বাণীরূপ দেখিলাম আজি নির্ঝরিণী
তোমার প্রবাহ মনেরে জাগায়, নিজেরে চিনি।

শেষের কবিতার নায়িকাকে সম্বোধন করে উপন্যাসের নায়ক বলছে 'তুমি ঝরণার মতো, তোমার চিত্তের প্রবাহ স্বচ্ছ, বিশ্বের আলোক তার মধ্যে অবাধে প্রতিফলিত হয়। তোমার সেই নির্মল হৃদয়ে আমার ছায়া পড়ুক, আমার চিন্তা তোমার হৃদয়ে দোলায়িত হতে থাক্—তোমার ভালোবাসার চিরন্তনতায় তাকে সত্য করো সার্থক করো।

'তোমার অন্তরে পড়েছে আমার ছায়া, তার মধ্যে মিলেছে তোমার আনন্দের দীপ্তি, তারি উপলব্ধিতে আমার অন্তরতম কবি আজ উল্লসিত। পদে পদে তোমার আনন্দের ছটায় আমার প্রাণে করে ভাষার সঞ্চার, আমার মনে জাগে তোমার

ভালোবাসার প্রবাহবেগ, তাব প্রেরণায আমাব যথার্থ স্বরূপকে জানি। তোমাতেই পাই আমাব প্রকাশরূপিণী বাণীকে।

"এক কথায এই কবিতাব মর্মার্থ এই যে অন্যের আনন্দের মধ্যে নিজেকে যখন প্রতিফলিত দেখি তখন নিজেব আত্মোপলব্ধি ও আত্মপ্রকাশ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।'

"অন্যেব আনন্দেব মধ্যে নিজেকে যখন প্রতিফলিত দেখি তখন নিজেব আত্মোপলব্ধি ও আত্মপ্রকাশ উজ্জ্বল হযে ওঠে"—এইটিই হইতেছে নির্ঝবিণী কবিতাব **latent content**।

আমবা তিনটি কবিতাব **latent content**এব পবিচয় পাইলাম।

প্রথমটি "সোনাব তবী"—ইহাব গূঢ়ভাব এই যে নিজেব জীবনেব সমস্ত সাধনা যাহাতে বিশ্বেব অংশীভূত হইযা থাকে তাহাব কামনা কবিতে পাব কিন্তু সেই সঙ্গে নিজেব 'অহং' থাকুক এ কামনা যেন মনে না আসে।

দ্বিতীয়টি "অনাদৃত"— তাহাব গূঢ় ভাব এই যে, প্রেয়েব জন্য সাধনা কব, তাহা হইলে শ্রেয়েব সাধনা আপনিই হইবে; এইরূপ ভাবে প্রেয় শ্রেয়েব উর্দ্ধে উঠিতে পাবিবে। সেইটিই জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধনা।

তৃতীয়টি "নির্ঝবিণী"—তাহাব গূঢ় ভাব এই যে নিজেব আত্মোপলব্ধি এবং আত্মপ্রকাশ উজ্জ্বল কবিবাব সাধন এই যে অন্যেব আনন্দেব মধ্যে নিজেকে প্রতিফলিত কবা।

এই সমস্ত ভাবই কবি কোনো কোনো স্থানে একসঙ্গে প্রকাশ কবিয়াছেন। যেমন

সীমাব মাঝে অসীম তুমি বাজাও আপন সুব,
আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ তাই এত মধুব।

'জীবনস্মৃতি'তে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন,

আমার তো মনে হয় আমার কাব্যরচনায় এই একটিমাত্র পালা—সে পালার নাম দেওয়া যাইতে পারে সীমার মধ্যেই অসীমের সহিত মিলনসাধনের পালা।

"সোনার তরী," "অনাদৃত" এবং "নির্ঝরিণী" এই তিনটি কবিতাতেই পর পর তাল, গান ও গতির পরিকল্পনা আছে এবং এই তিনটির মধ্যে বিভিন্ন মর্মকথায় যে যে সুর বাজিয়াছে তাহার সব সুরই, মানুষের ব্যক্তিত্ব-সীমার মধ্যে অসীম যে 'আপন সুর' বাজাইতেছেন তাহারই ঝংকারে এক হইয়া একই অপূর্ব পরিণতি লাভ করিয়াছে।

"সোনার তরী"র প্রথম স্তবক—

গগনে গরজে মেঘ ঘন বরষা।
তীরে একা বসে' আছি নাহি ভরসা।
রাশি রাশি ভারা ভারা ধান কাটা হ'ল সারা,
ভরা নদী ক্ষুরধারা খর-পরশা।
কাটিতে কাটিতে ধান এল বরষা।

এখানে মেঘগর্জনে এবং রাশি রাশি ভারা ভারা ধান কাটায় তাল, নদীপ্রবাহে গান ও বর্ষার আগমনে গতি বুঝাইতেছে।

"সোনার তরী" কবিতার শেষের স্তবক—

ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই, ছোট সে তরী
আমারি সোনার ধানে গিয়েছে ভরি।
শ্রাবণ-গগন ঘিরে
ঘনমেঘ ঘুরে ফিরে,
শূন্য নদীর তীরে রহিনু পড়ি,
যাহা ছিল নিয়ে গেল সোনার তরী।

এই স্তবকেও পর পর তাল, গান ও গতি আছে। "ঠাঁই নাই ঠাঁই নাই"-তে তাল, শ্রাবণ-মেঘের সঞ্চরণে গান এবং "যাহা ছিল নিয়ে গেল"-তে গতি বুঝাইতেছে।

"অনাদৃত" কবিতার প্রথম দুটি স্তবক—

তখন তরুণ রবি প্রভাতকালে
আনিছে উষার পূজা সোনার থালে।
সীমাহীন নীল জল
করিতেছে থল থল
রাঙারেখা জ্বল জ্বল
কিরণ মালে।
তখন উঠিছে রবি গগনভালে।

গাঁথিতেছিলাম জাল বসিয়া তীরে।
বারেক অতল পানে চাহিনু ধীরে।
শুনিনু কাহার বাণী
পরান লইল টানি,
যতনে সে জালখানি তুলিয়া শিরে
ঘুরায়ে ফেলিয়া দিনু সুদূর নীরে।

এই দুটি স্তবকেই ত্রয়ী পরিকল্পনা আছে। প্রথম স্তবকে "সীমাহীন নীল জল, করিতেছে থল থল"-এ তাল, কিরণমালার রাঙা রেখায় গান, এবং রবির উদয়ে গতি সূচিত হইয়াছে।

দ্বিতীয় স্তবকে জাল গাঁথা তাল, "শুনিনু কাহার বাণী" গান এবং "ঘুরায়ে ফেলিয়া দিনু সুদূর নীরে" গতির দ্যোতক।

"নির্ঝরিণী" কবিতার দুটি স্তবকেই পর পর তাল, গান ও গতি আছে।

প্রথম স্তবকে "আনি মাঝে মাঝে দুলায়ো তাহারে"-তে তাল, "হাসিয়া মিলায়ো কলধ্বনি"-তে গান এবং চিরন্তনী বাণী প্রদানে গতি বুঝাইতেছে।

দ্বিতীয় স্তবকে "পদে পদে তব আলোর ঝলকে" তাল, "মোর বাণীরূপ" গান এবং "তোমার প্রবাহ মনেরে জাগায়" গতির সূচনা করিতেছে।

এই তিনটি কবিতারই গূঢ় তাৎপর্য সাধারণ অর্থের সীমা অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। ইহাদের শব্দ-ঝংকারের মধ্য দিয়া এমন এক সীমাতীতের অনুভূতি আমাদের মনে আসিয়া বাজে যাহার স্বরূপ ব্যাখ্যায় বুঝানো সম্ভব নয়।

আমরা এই প্রবন্ধের সূচনাতেই "প্রতীক" সম্বন্ধে অজিত-কুমারের মন্তব্য উদ্ধৃত করিয়াছি। অজিতকুমার বলিয়াছেন, ভাষা যে-অনুভূতিকে সম্পূর্ণ প্রকাশ করিতে অক্ষম হয় তাহা প্রকাশ করিবার জন্য বিগ্রহ বা symbolকে আশ্রয় করিতে হয় অর্থাৎ ইশারা-ইঙ্গিতে তাহার খানিকটা আভাস দিতে হয়।

পর পর তাল, গান ও গতিই সেই ইশারা বা প্রতীক; রবীন্দ্রনাথের যে-সকল কবিতায় পর পর তাল, গান ও গতির পরিকল্পনা ফুটিয়া উঠিয়াছে প্রায়ই সেই সেই স্থানে কবিতার তাৎপর্য্য সাধারণ অর্থকে অতিক্রম করিয়া অসীমের 'আপন সুরের' ঝঙ্কারে ঝঙ্কৃত হইয়াছে—অন্যভাবে বলিতে গেলে, যেখানে যেখানে ভাব আপনাকে ব্যক্ত করিবার প্রয়াসে উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছে সেইখানেই পর পর তাল, গান ও গতি প্রতীকরূপে স্বতই আবির্ভূত হইয়াছে।

স্বপ্নচৈতন্যের latent content বা মর্মকথা বিশ্লেষণ করিয়া

দেখা যায় যে এই মর্ম্মকথার গূঢ়ভাব অবচেতন-মনের বিভিন্ন স্তরের মধ্য দিয়া কিছু বিভিন্ন ভাবে প্রকাশ পাইয়া থাকে। একটি স্তরের মধ্য দিয়া ইহার ভাব কতকটা আমাদের উপলব্ধির গোচর হয় বটে কিন্তু সবটা আমরা উপলব্ধি করিতে পারি না।

মনোবিশ্লেষণ দ্বারা মনের আরও গভীর স্তরে পৌছিলে বুঝিতে পাবি যে, আমাদের পূর্ব্বের উপলব্ধি আংশিক উপলব্ধি মাত্র। আরও গভীর স্তরের মধ্য দিয়া উপলব্ধি কবিতে সমর্থ হইলে বুঝিতে পাবি যে পূর্ব্বের উপলব্ধিটি এই শেষোক্ত গভীরতর স্তরের উপলব্ধিরই অন্তর্ভুক্ত। তাল, গান ও গতির ত্রয়ী পরিকল্পনার ভিতর দিয়া আমরা কবিব কবিতার মর্ম্মকথা উপলব্ধির যে স্তরে উপনীত হইয়াছি তাহা হইতে আরও একটি গভীরতর উপলব্ধিতে পৌছিতে চেষ্টা করিব।

একের চিত্তের অবচেতন-মনের ভাব অন্যের চিত্তে প্রতিফলিত হওয়া অবচেতন-মনের ব্যাপার।

কবির জ্যেষ্ঠা ভগিনী শ্রীযুক্তা সৌদামিনী দেবীর দৌহিত্র শ্রীমান অরুণরঞ্জন মুখোপাধ্যায় “অনামী” নামে একটি সনেট লিখিয়া কবিকে সংশোধন করিতে দেন। সংশোধনে কবিতার রূপ ও নাম উভয়ই পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়া “গোধূলি লগ্ন” নামে একটি নূতন কবিতার রূপ ধারণ করে। এই কবিতার শেষ কয় ছত্র এইরূপ ঃ

এই মতে একদিন আলোর আঁধারে
এসেছিলে তুমি মোর স্বপনের পারে।
তার আগে তুমি মোরে চিনিতে না কভু,
আমার পূজার মালা নিয়েছিলে তবু।

তার পর আজ পথে চলেছিনু একা
গোধূলিতে তোমা সনে শুধু হল দেখা ;
তোমার দক্ষিণ হাতে ওই দীপখানি
নীরবে আমার প্রাণে কি কহিল বাণী,
তারপর হ'তে খুঁজি বনবীথিকায়
তোমার আসনখানি পাতিব কোথায় ?—ভারতবর্ষ, পৌষ, ১৩৩৮

এই কবিতায় যে-ছবিটি পাই সেটি স্বপ্নের ছবি। প্রণয়ী দেখিতেছেন, তাঁহার প্রেমাস্পদা গোধূলির আধ-আলো আধ-আঁধারে শঙ্কিতচরণে একটি দীপ হাতে লইয়া আসিতেছেন। তাঁহার সেই দক্ষিণ হাতের দীপখানি প্রণয়ীর প্রাণের মাঝে কি এক বাণী প্রেরণ করিল। তাহার পর হইতে প্রণয়ী বন-বাথিকায় কোথায় যে তাঁহার প্রেমাস্পদার আসন স্থাপন করিবেন তাহাই খুঁজিয়া বেড়াইতেছেন।

এই কবিতায় প্রেমাস্পদার শঙ্কিত পদে আগমনে তালের, প্রণয়ীর হৃদয়ে তাঁহার দক্ষিণ হাতের আলোকের দ্বারা যে বাণী প্রেরণ করিলেন তাহাতে গানের এবং আসন স্থাপনের যোগ্য স্থান অন্বেষণে গতির পরিকল্পনা পাওয়া যাইতেছে।

প্রেমাস্পদার প্রেম আলোকরূপে কবির প্রাণে যে বাণী প্রেরণ করিল তাহাই গানের রূপ ধারণ করিয়া উৎসারিত হইয়াছে, অর্থাৎ প্রেমাস্পদার বাণীই প্রণয়ীর প্রাণে বাণীর সঞ্চার করিয়াছে। এই বর্ণনায় "নির্ঝরিণী" কবিতার সেই কয় ছত্রই যেন অন্যভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে :

আমার ছায়াতে তোমার ছায়াতে মিলিত ছবি,
তাই নিয়ে আজ পরানে আমার মেতেছে কবি।

পদে পদে তব আলোর ঝলকে
ভাষা আনে প্রাণে পলকে পলকে,
মোর বাণীরূপ দেখিলাম আজি নির্ঝরিণী
তোমার প্রবাহ মনেরে জাগায় নিজেরে চিনি।

তোমাতেই পাই আমার প্রকাশরূপিণী বাণীকে, তোমার প্রেমপ্রবাহ যখন আমার সুপ্ত মনকে জাগাইয়া তোলে তখনই আমি নিজেকে চিনিতে পারি, তখনই আমার আত্মোপলব্ধি ও আত্মপ্রকাশ উজ্জ্বল হইয়া উঠে।

'মালিনী' নাটিকার ব্যাখ্যাতেও কবি একজনের অন্তর হইতে এই ভাবে অন্যের অন্তরে উচ্চভাব প্রতিফলিত হইবার কথা বলিয়াছেন :

সত্য যার স্বভাবে, যে মানুষের অন্তরে অপরিমেয় করুণা, তার অন্তঃকরণ থেকে এই পরিপূর্ণ মানবদেবতার আবির্ভাব অন্য মানুষের চিত্তে প্রতিফলিত হতে থাকে।

এই যে একের চিত্তের ভাব অন্যের চিত্তে প্রতিফলিত হওয়া ইহা অবচেতন-মনেরই ব্যাপার।

মালিনী নাটিকার বাহিরের রূপ ও মর্মকথা

মালিনী নাটিকার উৎপত্তি হয় স্বপ্নে। কবি তাহার উৎপত্তির ইতিহাস সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহা এখানে উদ্ধৃত করিতেছি।

মালিনী নাটিকার উৎপত্তির একটা বিশেষ ইতিহাস আছে, সে স্বপ্নঘটিত। কবিকঙ্কণকে দেবী স্বপ্নে আদেশ করেছিলেন তাঁর গুণকীর্তন করতে। আমার স্বপ্নে দেবীর আবির্ভাব ছিল না, ছিল হঠাৎ মনের একটা গভীর আত্মপ্রকাশ ঘুমন্ত বুদ্ধির সুযোগ নিয়ে।

তখন ছিলুম লণ্ডনে। নিমন্ত্রণ ছিল প্রিমরোজ হিলে তারক পালিতের বাসায়। ...গোলেমালে রাত হয়ে গেল।.. পালিত সাহেবের অনুরোধে তাঁর ওখানেই রাত্রিযাপন স্বীকার করে নিলুম।...

স্বপ্ন দেখলুম, যেন আমার সামনে একটা নাটকের অভিনয় হচ্ছে। বিষয়টা একটা বিদ্রোহের চক্রান্ত। দুই বন্ধুর মধ্যে এক বন্ধু কর্তব্যবোধে সেটা ফাঁস করে দিয়েছেন রাজার কাছে। বিদ্রোহী বন্দী হয়ে এলেন রাজার সামনে। মৃত্যুর পূর্বে তাঁর শেষ ইচ্ছা পূর্ণ করবার জন্য তাঁর বন্ধুকে যেই তাঁর কাছে এনে দেওয়া হল দুই হাতের শিকল তাঁর মাথায় মেরে বন্ধুকে দিলেন ভূমিসাৎ করে।

জেগে উঠে যেটা আমাকে আশ্চর্য ঠেকল সেটা হচ্ছে এই যে, আমার মনের এক ভাগ নিশ্চেষ্ট শ্রোতা মাত্র অন্য ভাগ বুনে চলেছে একখানা নাটক। স্পষ্ট হোক অস্পষ্ট হোক একটা কথাবার্তার ধারা গল্পকে বহন করে চলেছিল। জেগে উঠে সে আমি মনে আনতে পারলুম না। পালিত সাহেবকে মনের ক্রিয়ার এই বিস্ময়-বারতা জানিয়েছিলুম। তিনি এটাতে বিশেষ কোনো ঔৎসুক্য বোধ করলেন না।

কিন্তু অনেক কাল এই স্বপ্ন আমার জাগ্রত মনের মধ্যে সঞ্চরণ করেছে। অবশেষে অনেক দিন পরে এই স্বপ্নের স্মৃতি নাটিকার আকার নিয়ে শান্ত হল।

'মালিনী' নাটিকার ন্যায় স্বপ্নচৈতন্যের ভিতর সাহিত্যসৃষ্টির অন্য কতকগুলি দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। বিখ্যাত ইংরেজ কবি কোল্‌রীজের দুইটি বিখ্যাত কবিতা Rime of the Ancient Mariner এবং Kubla Khan স্বপ্নের মধ্যে মূর্তিগ্রহণ করিয়াছিল। স্টিভেনসন তাঁহার বিখ্যাত গল্প Dr. Jekyll and Mr. Hydeএর উপাখ্যান-ভাগ স্বপ্ন হইতেই পাইয়াছিলেন। রবীন্দ্র-সাহিত্যে ইহার অন্যতর নিদর্শন 'রাজর্ষি'।

প্রত্যেক স্বপ্নচিত্রের যেমন বাহিরের রূপ বা manifest content এবং মর্মকথা বা latent content থাকে মালিনী নাটিকারও তাহা আছে। কবি স্বয়ং সে-সম্বন্ধে বলিয়াছেন,

মালিনীর নাট্যরূপ সংযত ও সংহত এবং দেশকালের ধারায় অবিচ্ছিন্ন। এর বাহিরের রূপায়ন সম্বন্ধে যে মত শুনেছিলুম এ হচ্ছে তাই। কবিতার মর্মকথাটি প্রথম থেকেই যদি রচনার মধ্যে জেনে শুনে বপন করা না হয়ে থাকে তবে কবির কাছেও সেটা প্রত্যক্ষ হয়ে উঠতে দেরি লাগে। আজ আমি জানি মালিনীর মধ্যে কী কথাটি লিখতে লিখতে উদ্ভাবিত হয়েছিল গৌণরূপে ঈষৎগোচর। আসল কথা, মনের একটা সত্যকার বিস্ময়ের আলোড়ন ওর মধ্যে দেখা দিয়েছে।

আমার মনের মধ্যে ধর্মের প্রেরণা তখন গৌরীশংকরের উত্তুঙ্গ শিখরে শুভ্র নির্মল তুষারপুঞ্জের মত নির্মল নির্বিকল্প হয়ে স্তব্ধ ছিল না, সে বিগলিত হয়ে মানবলোকে বিচিত্র মঙ্গলরূপে মৈত্রীরূপে আপনাকে প্রকাশ করতে আরম্ভ করেছে। নির্বিকার তত্ত্ব নয় সে, মূর্তিশালার মাটিতে পাথরে নানা অদ্ভুত আকার নিয়ে মানুষকে সে হতবুদ্ধি করতে আসেনি। কোনো দৈববাণীকে সে আশ্রয় করেনি। সত্য যার স্বভাবে, যে মানুষের অন্তরে অপরিমেয় করুণা তার অন্তঃকরণ থেকে এই পরিপূর্ণ মানবদেবতার আবির্ভাব অন্য মানুষের চিত্তে প্রতিফলিত হতে থাকে। সকল আনুষ্ঠানিক সকল পৌরাণিক ধর্মজটিলতা ভেদ করে তবেই এর যথার্থ স্বরূপ প্রকাশ পেতে পারে।

আমার এ মতের সত্যাসত্য আলোচ্য নয়। বক্তব্য এই যে, এই ভাবের উপর মালিনী স্বতই নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে, এরই যা দুঃখ এরই যা মহিমা সেইটেতেই এর কাব্যরস। এই ভাবের অঙ্কুর আপনা-আপনি দেখা দিয়েছিল 'প্রকৃতির প্রতিশোধে', সে-কথা ভেবে দেখবার যোগ্য। "নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গে" হয়তো তারও আগে এর আভাস পাওয়া যায়।

অবচেতন-মনের ক্রিয়ায় স্বপ্নচৈতন্যের মধ্য দিয়া যে-সকল সৃষ্টি হয় সৃষ্টিকার নিজেও তাহার তাৎপর্য সহজে ধরিতে পারেন না, তাই কবি 'মালিনী' নাটিকা রচনার বহুদিন পরে বলিতেছেন, "আজ আমি জানি মালিনীর মধ্যে কী কথাটি লিখতে লিখতে উদ্ভাবিত হয়েছিল গৌণরূপে ঈষৎ গোচর।" স্বপ্নছবির যে latent content সেটি গৌণরূপেই থাকে। যদি বা গোচর হয়, সম্পূর্ণ

গোচর হয় না। বাহিরের ছবিটিই তাহার মুখ্যরূপের ভূমিকা গ্রহণ করে, যেটি প্রকৃত মর্মকথা সেটি তাহারই অন্তরালে রহিয়া যায়। এইভাবে স্বপ্নচেতনার ভিতর দিয়া যে রচনা মূর্তিগ্রহণ করে সাধারণ রচনার সহিত তাহার একটি বিশেষ পার্থক্য থাকে। তাহার গভীর ভাবময় অপরূপত্ব পাঠকের মনে এমন এক অনুভূতি আনিয়া দেয় যাহা সুলিখিত সাধারণ রচনার ভিতর পাওয়া যায় না।

কবির "জীবন-দেবতা"

এখানে আর একটি কথা আমরা কবির উক্তি হইতে পাইতেছি, সেটি এই যে, স্বপ্নে তিনি অনুভব করিয়াছিলেন তাঁহার ব্যক্তিত্ব যেন দুইভাগে বিভক্ত হইয়া গিয়াছে, "এক ভাগ নিশ্চেষ্ট শ্রোতা মাত্র, আর এক ভাগ বুনে চলেছে নাটক।"

এরূপ উক্তি অন্যত্রও পাই। রবীন্দ্রনাথ 'বঙ্গ-ভাষার লেখক' গ্রন্থে (১৩১১) আত্মপরিচয়ে তাঁহার "অন্তর্যামী" ও "জীবন-দেবতা" সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন এখানে তাহা হইতে অংশবিশেষ উদ্ধৃত করি।

আমার সুদীর্ঘ কালের কবিতা লেখার ধারাটাকে পশ্চাৎ ফিরিয়া যখন দেখি তখন ইহা স্পষ্ট দেখিতে পাই, এ একটা ব্যাপার যাহার উপরে আমার কোনো কর্তৃত্ব ছিল না। যখন লিখিতেছিলাম. তখন মনে করিয়াছি বটে আমিই লিখিতেছি বটে, কিন্তু আজ জানি, কথাটা সত্য নহে। কারণ সেই খণ্ডকবিতাগুলিতে আমার সমগ্র কাব্যগ্রন্থের তাৎপর্য সম্পূর্ণ হয় নাই—সেই তাৎপর্যটি কী তাহাও আমি পূর্বে জানিতাম না। এইরূপে পরিণাম না জানিয়া আমি একটির সহিত একটি কবিতা যোজনা করিয়া আসিয়াছি;—তাহাদের প্রত্যেকের যে ক্ষুদ্র অর্থ কল্পনা করিয়াছিলাম,

আজ সমগ্রের সাহায্যে নিশ্চয় বুঝিয়াছি, সে অর্থ অতিক্রম করিয়া একটি অবিচ্ছিন্ন তাৎপর্য তাহাদের প্রত্যেকের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া আসিয়াছিল। তাই দীর্ঘকাল পরে একদিন লিখিয়াছিলাম—

এ কী কৌতুক নিত্য নূতন
ওগো কৌতুকময়ী।
আমি যাহা কিছু চাহি বলিবারে
বলিতে দিতেছ কই।
অন্তর মাঝে বসি অহরহ—
মুখ হ'তে তুমি ভাষা কেড়ে লহ,
মোর কথা লয়ে তুমি কথা কহ—
মিশায়ে আপন সুরে।
কী বলিতে চাই সব ভুলে যাই,
তুমি যা বলাও আমি বলি তাই,
সংগীত-স্রোতে কূল নাহি পাই—
কোথা ভেসে যাই দূরে।

'...এই যে কবি, যিনি আমার সমস্ত ভালোমন্দ আমার সমস্ত অনুকূল ও প্রতিকূল উপকরণ লইয়া আমার জীবনকে রচনা করিয়া চলিয়াছেন তাঁহাকেই আমার কাব্যে আমি "জীবনদেবতা" নাম দিয়াছি। তিনি যে কেবল আমার এই ইহজীবনের সমস্ত খণ্ডতাকে ঐক্য দান করিয়া বিশ্বের সহিত তাহাব সামঞ্জস্য স্থাপন করিতেছেন, আমি তাহা মনে করি না—আমি জানি অনাদিকাল হইতে বিচিত্র বিস্মৃত অবস্থার মধ্য দিয়া তিনি আমাকে আমার এই বর্তমান প্রকাশের মধ্যে উপনীত করিয়াছেন ;—সেই বিশ্বের মধ্য দিয়া প্রবাহিত অস্তিত্বধারার বৃহৎ স্মৃতি তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া আমার অগোচরে আমার মধ্যে রহিয়াছে।

কবির মহান্ জীবন কি ভাবে কোন্ পথে বিকাশের ধারা ধরিয়া চলিয়াছিল সে-বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত করিবার স্পর্ধা আমাদের নাই; আমরা তাল, গান ও গতির পরিকল্পনার সূত্র

অনুসরণ করিয়া কবির কবিতার সহিত ইহার সম্পর্ক নির্ণয় করিতে যে পথে চলিয়াছি তাহাতে এ সম্বন্ধে আমাদের কিছু আলোচনার প্রসঙ্গে আসিতেই হইবে।

বৃহৎ অহং ও সাধারণ অহং

মালিনী নাটিকার স্বপ্নের বিবৃতিতে আমরা দেখিয়াছি কবির অহং স্বপ্নকালে দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া গিয়াছিল, একটি নাটক সৃষ্টি করিতেছিল ও অপরটি অভিনয় দর্শন করিতেছিল। মনস্তত্ত্বে এই দুইটি অহংএর বিভিন্ন আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। যে অহং হইতে এই ভাবময় অভিনয়ের চিত্রটি মনের ভিতর প্রস্ফুটিত হইতেছিল তাহাকে আমরা 'বৃহৎ অহং' আখ্যা দিতে পারি, মনস্তত্ত্বের ভাষায় ইহাকে super ego বলা হয়।

'মালিনী' নাটিকার বাহিরের দৃশ্য এক বিদ্রোহের চক্রান্ত। রাজকুমারীকে প্রজাগণ নির্বাসন দিবার জন্য যে চক্রান্ত করিয়াছিল মনস্তত্ত্বের দিক দিয়া দেখিলে তাহা বৃহৎ অহংএর বিরুদ্ধে সাধারণ অহংএর ষড়যন্ত্র। ক্ষেমংকর সাধারণ অহংএর প্রতিনিধি। মালিনীর প্রভাবান্বিত সুপ্রিয় বৃহৎ অহংএর প্রতিনিধি। সাধারণ অহং চিরাচরিত প্রথাকেই 'ধর্ম' নাম দিয়া আঁকড়াইয়া থাকিতে চাহে, বৃহৎ অহং মঙ্গলরূপে মৈত্রীরূপে আবির্ভূত হইয়া তাহাকে জড়ত্বপাশ হইতে মুক্ত করিতে চাহে। ক্ষেমংকর কর্তব্যনিষ্ঠ হইলেও এই জড়ত্বের মোহে মুগ্ধ, সে তাহার বিচারে মহৎ বা শ্রেষ্ঠ অহংএর প্রতিনিধিকে ধ্বংস করাই কর্তব্য বিবেচনা করিয়াছে।

বৃহৎ বা শ্রেষ্ঠ অহংরূপা মালিনী মৈত্রী ও করুণার দ্বারা দারুণ অন্যায়কারীকেও ক্ষমা করিয়া স্নেহ ও প্রেমে জয় করিয়া লইতেছেন।

কবি তাঁহার নিজের ভিতরে যে এই দুই অহংই বর্ত্তমান আছে তাহা অনুভব করিয়াছেন। তাঁহার কিশোর-বয়সের লেখা "নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ" কবিতার ব্যাখায় তিনি বলিয়াছেন,

"আমারই মধ্যে দুটো দিক আছে, এক আমাতেই বদ্ধ আর এক সর্বত্র ব্যাপ্ত। এই দুই-ই যুক্ত এবং উভয়কে মিলিয়েই আমার পরিপূর্ণ সত্ত্বা।

'কণিকা'-য় কবি লিখিয়াছেন,

> অদৃষ্টেরে শুধালেম, চিরদিন পিছে
> অমোঘ নিষ্ঠুর বলে কে মোরে ঠেলিছে ?
> সে কহিল ফিরে দেখো, দেখিলাম আমি
> সম্মুখে ঠেলিছে মোর পশ্চাতের আমি।

কবির এই পশ্চাতের আমিই কবির বৃহৎ অহং, তাহারই প্রেরণার অগ্রগতি কবিকে আত্মপ্রকাশের পথে আগাইয়া দিতেছে।

কবির একখানি পত্র

কবি একটি চিঠিতে লিখিয়াছেন,

তোমার চিঠি পেয়ে সুখী হলুম। স-বাবু কবিতাকে যে দিক দিয়ে যাচাই করতে চান সেদিক দিয়ে সজীব কবিতার সন্ধান পাওয়া যায় না। বন্ধুকে যদি শরীর-তত্ত্বরূপে বিচার করি শরীর তত্ত্ব মিলতে পারে কিন্তু বন্ধু থাকেন কোথায় ? কবিতার পরিচয় তার রসে, সেটাকে পাই সমগ্র স্বাদের দ্বারা, বিষয়বিশ্লেষণের দ্বারা নয়। প্রথমে তাল, পরে গান তার পর গতি, কবিতার এ পর্যায়ের মানেই নেই। সমস্তটা

জড়িয়ে একটা অখণ্ড জিনিস। একটা নদী চলছে, তাকে আমরা ভাগ করে বলতে পারিনে আগে তার ঢেউ, তার পর জল, তার পর ধারা, ওর একসঙ্গেই সব।—প্রবাসী, বৈশাখ, ১৩৩৫

কবির এই উক্তি যে একদিক দিয়া অতি সত্য তাহাতে সন্দেহ নাই। তাল, গান ও গতির পরিকল্পনা পর পর আছে বটে কিন্তু তাহারা তিনটি মিশিয়া একটি অখণ্ড জিনিস ইহাও সত্য। তবে তাহাদের ভিতর একটি পর্যায়ের ভঙ্গী আছে; সেই ভঙ্গী যেন সমগ্রতার লীলাজ্ঞাপনেষ ইঙ্গিতস্বরূপ।

তাল, গান ও গতি যেমন পর পর আছে সেইরূপ উপনিষদের মন্ত্রে শান্তম্ শিবম্ ও অদ্বৈতম্ পর পর আছে, কিন্তু যিনি শান্তম্ তিনিই শিবম্ এবং এবং তিনিই অদ্বৈতম্। এক অদ্বৈতম্ এবং নদীর একই গতিপ্রবাহ, সেই প্রবাহের ভিতরেই আছে তরঙ্গের তাল, তার ভিতরেই আছে জলকল্লোলের গান। সুতরাং তাল, গান ও গতি পর পরও বটে এবং একসঙ্গেই সবও বটে।

কবি উপরে উদ্ধৃত পত্রে শরীরতত্ত্বের উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তকে লিখিত তাঁহার পত্রেও শরীরতত্ত্বের উল্লেখ আছে। 'শেষ রক্ষা' পুস্তকেও এই শরীরতত্ত্বের উল্লেখ আছে:

চন্দ্র। এই যে আসছে আমাদের মেডিক্যাল স্টুডেণ্ট। (নিমাইয়ের প্রবেশ) এই যে নিমাই। শরীরতত্ত্ব ছেড়ে হঠাৎ কবির দরবারে যে। তোমার বাবা জানলে শিউরে উঠবেন।

নিমাই। না ভাই, প্যাথলজি স্টাডি করবার পক্ষে তোদের সংসর্গটা একেবারেই ব্যর্থ নয়। তোদের হৃদয়টা যে সর্বদাই আই ঢাই করছে সেটা অজীর্ণ রোগেরই একটা নামান্তর তা জানিস। বেশ ভালো করে আহারটি করে সেটি হজম করতে পারলে কবিত্বরোগ কাছে ঘেঁসতে পারে না।

'শেষ রক্ষা' পুস্তকের চরিত্রগুলির ভিতর নিমাই কবির বিশেষ স্নেহের পাত্র বলিয়া মনে হয়। তাহাকে উপলক্ষ্য করিয়া শরীর-তত্ত্বের উল্লেখ দ্বারা সস্নেহ কৌতুকচ্ছলে কবি যে উপহাস করিয়াছেন তাহাতে ডাক্তারদের চিন্তাপ্রণালী সম্বন্ধে ইঙ্গিত আছে। উপরে উদ্ধৃত পত্র ও তাঁহার এই রচনাটি একত্রে মিলাইলে মনে হয় যেন তিনি স্নেহ-কৌতুকে বলিতেছেন, "সরসীবাবুরও নিমাইয়ের মতই অবস্থা। কবিত্বরস বুঝিতে গিয়াও ডাক্তারদের শরীরতত্ত্বের বিশ্লেষণ ছাড়া গতি নাই।"

মনোবিশ্লেষণ সম্বন্ধে দুই-চারিটি কথা

মানুষের দেহাত্মবুদ্ধির গণ্ডির ভিতরেই আধুনিক মনো-বিশ্লেষণের সীমা।

আধুনিক মনোবিশ্লেষণ-বিজ্ঞানের গবেষণা-প্রণালীর উপর কবি প্রসন্ন ছিলেন না। বস্তুত এই মনোবিশ্লেষণের নামে অনেক সময় যে অনেক অসংগত সিদ্ধান্তও না করা হয় এমন নয়। কবি আমাকে বলিয়াছিলেন, "তোমরা কি সবজান্তা তাই সাইকো-অ্যানালিসিস কর? এই ধর তোমার মন আর আমার মন, এ-দুটি কি এক বস্তু? তোমার মন দিয়ে আমার মনের সব বিষয় কি তুমি বুঝতে পার কি ধরতে পার?"

মনোবিজ্ঞানের পক্ষ হইতে কবির এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কঠিন, কেননা মানুষের দেহাত্মবুদ্ধির গণ্ডীর ভিতরেই আধুনিক মনোবিশ্লেষণের সীমা। মনস্তাত্ত্বিকগণ এই দেহাত্মবুদ্ধির গণ্ডীর বাহিরে মনের অন্য কোনো স্তর আছে বা থাকিতে পারে এমন

সিদ্ধান্তে এখনও উপনীত হন নাই। যতক্ষণ না বৈজ্ঞানিক গবেষণার দ্বারা এরূপ কিছুর অস্তিত্ব প্রমাণিত হয় ততক্ষণ তাঁহারা এরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারেন না। সুতরাং আধুনিক মনস্তত্ত্ব যে শরীরতত্ত্বেরই সমপর্যায়ভুক্ত এ-কথা অযথা নয়।

কবি যে আধুনিক মনস্তত্ত্বের এই গবেষণা-প্রণালীতে বেদনা বোধ করিয়াছেন, 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাসে নিখিল ও সন্দীপের কথোপকথনে তাহার আভাস পাওয়া যায়।

নিখিল বললে......য়ুরোপে মানুষের সব জিনিসকে বিজ্ঞানের তরফ থেকে যাচাই করছে, কিন্তু মানুষ পদার্থটি যে কেবলমাত্র দেহতত্ত্ব কিম্বা জীবতত্ত্ব নয় দোহাই তোমাদের সে-কথা ভুলো না।

আমি বললুম, নিখিল, আজকাল তুমি এমন উত্তেজিত হয়ে আছ কেন?

সে বললে, আমি যে স্পষ্ট দেখছি তোমরা মানুষকে ছোট করছ, অপমান করছ।

কোথায় দেখছ?

হাওয়ার মধ্যে, আমার বেদনার মধ্যে। মানুষের মধ্যে যিনি সব চেয়ে বড়, যিনি তাপস, যিনি সুন্দর, তাঁকে তোমরা কাঁদিয়ে মারতে চাও।

নিখিলের এই কথাগুলির মধ্য দিয়া যেন কবির নিজের মনোবেদনাই প্রকাশ পাইয়াছে। মানুষের যে অন্তরতম পরম শ্রেষ্ঠত্ব, বিজ্ঞানের তরফ হইতে বিশ্লেষণাত্মক গবেষণার দ্বারা তাহাকে অস্বীকার করিয়া মানুষকে ছোট ও অপমানিত করা হইতেছে একভাবে এ-কথা সত্য।

কিন্তু গবেষণাই চরম সিদ্ধান্ত নয়। মনোবিজ্ঞান বস্তুত শরীরতত্ত্বকেই চরম বলিয়া গ্রহণ করে নাই, সীমার সহিত অসীমের সংযোগের উপলব্ধির পথ অনুসন্ধান বিজ্ঞানেরও উদ্দেশ্য। বিজ্ঞান কি, তাহা বুঝাইবার জন্য বৈজ্ঞানিকগণ বলিয়াছেন, বিজ্ঞান

হইতেছে সান্তের মধ্যে অনন্তের প্রকাশ। সীমাবদ্ধ ঘটনা লইয়া গবেষণা যতক্ষণ না সেই ঘটনার মধ্যে সীমার সহিত অসীমের যে যোগ রহিয়াছে তাহার উপলব্ধির পথে অগ্রসর হয় ততক্ষণ তাহা প্রকৃত বৈজ্ঞানিক আলোচনা আখ্যা পাইবার যোগ্য হয় না।

তবে ইহাও সত্য যে, বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান-প্রণালীতে বহু ভুল-ভ্রান্তি থাকে এবং সে ভুল সাধারণত ক্রমশ সংশোধিত হয়, কারণ, মানুষের বুদ্ধি, জ্ঞান ও অনুভবশক্তি সীমাবদ্ধ, তাহা ক্রমশ বিকাশ লাভ করিতেছে।

মনস্তত্ত্ববিদ যাহাকে অবচেতন মন বলেন সেই গভীরতম মনে নানা স্তর আছে। দেহাত্মবুদ্ধির গণ্ডীতে সীমাবদ্ধ মনের স্তরে তাহার উচ্চতর স্তরের মন হইতে প্রেরণা-লাভ রূপ যে একটি ব্যাপার আছে সেই সত্যটি এখন পর্যন্ত মনস্তত্ত্বের গবেষণায় সিদ্ধান্তরূপে গৃহীত হয় নাই। কিন্তু মনে হয়, এই সত্যটিই অবচেতন মনের ক্রিয়ার সার কথা।

আমরা এই প্রবন্ধে মনোবিশ্লেষণের যে-প্রণালী ধরিয়া চলিতে চেষ্টা করিয়াছি তাহাতে কবির মনের সম্পূর্ণ নাগাল পাওয়া যাইবে এ ভরসা আমাদের খুব বেশী নাই এ-কথা স্বীকার করা অবৈজ্ঞানিক হইবে না; বিজ্ঞানসাধনা নাগাল পাইবার সাধনা, সে-সাধনায় ব্যর্থতার মধ্যে দিয়াই সাফল্য লাভ হয়।

রথযাত্রা নাট্যে কবির বর্ণনায় তাল, গান ও গতির পরিকল্পনার শান্তম্ শিবম্ অদ্বৈতম্ রূপে প্রকাশ

কবি। ঠাট্টা নয় পুরুতঠাকুর, মহাকাল বারে বারে রথযাত্রায় কবিদের ডেকেছেন, তারা কাজের লোকের ভিড় ঠেলে পৌঁছতে পারে নি।

পুরোহিত। তারা রথ চালাবে কিসের জোরে?

কবি। গায়ের জোরে নয়ই। আমরা মানি ছন্দ, আমরা জানি একঝোঁকা হলেই তাল কাটে। আমরা জানি সুন্দরকে কর্ণধার করলে শক্তির তরী সত্যি বশ মানে। তোমরা বিশ্বাস কর কঠোরকে, সে কঠোর শাস্ত্রের কঠোর বা অস্ত্রের কঠোর,—সেটা হল ভীরুর বিশ্বাস, দুর্বলের বিশ্বাস, অসাড়ের বিশ্বাস।

সৈনিক। ওহে কবি, তুমি তো উপদেশ দিতে বসলে, ওদিকে যে আগুন লাগল।

কবি। যুগে যুগে কতবার কত আগুন লেগেছে। যা থাকবার তা থাকবেই।

সৈনিক। তুমি কি করবে?

কবি। আমি গান গাব 'ভয় নেই'।

সৈনিক। তাতে কি হবে?

কবি। যারা রথ টানবে তারা চলবার তাল পাবে। বেতালা টানটাই ভয়ংকর।

এই কথাচিত্রে আমরা দেখিতেছি মহাকালের রথযাত্রা। বিশ্বমানবসংঘ সেই রথ টানিয়া চলিয়াছে সীমার মধ্য দিয়া অসীমত্বের উপলব্ধির পথে।

সীমার মধ্যে অসীমের ব্যাখ্যাস্বরূপ কবি 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' নাটিকায় লিখিয়াছেন,

অসীম হতেছে ব্যক্ত সীমারূপ ধরি।

জগৎ অর্থ অনন্ত গতি। জগৎ নিজের গতিবেগে ধ্বংস হইতেছে না, তালে তালে আবর্তিত হইতেছে।

কবি এ-বিষয়টি তাঁহার 'ধর্ম' পুস্তকে এইভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন :

গাড়ির কলটা চলিতেছে, গাড়ির চাকাগুলি ছুটিতেছে তবুও গাড়ির মধ্যে গাড়ির এই চলাটাই কর্তা নহে, সমস্ত চলার মধ্যে যে অচল হইয়া আছে, যথেষ্ট পরিমাণ না চলার দ্বারা যে ব্যক্তি প্রতি মুহূর্তে স্থিরভাবে নিয়মিত করিতেছে সেই কর্তা।

এই কর্তা হইতেছেন অচল অর্থাৎ শান্তম্। তিনি যথেষ্ট পরিমাণ চলাকে যথেষ্ট পরিমাণ না-চলার দ্বারা প্রতি মুহূর্তে স্থির ভাবে নিয়মিত করিতেছেন অর্থাৎ তাল দিতেছেন।

মহাকালের তালে তাল মিলাইয়া চলাই সীমার ভিতর দিয়া অসীমের সুরে সুর মিলানো।

যদি আসে মহাকাল, উদ্দাম জটাজাল
ঝড়ে হয় লুণ্ঠিত ঢেউ উঠে উত্তাল,
হোয়ো না কো কুণ্ঠিত তালে তার দিও তাল
"জয় জয় জয়" গান গাইও।

মহাকালের এই তালে তাল দিবার শক্তি ভীত, দুর্বল, অসাড়, সীমার বন্ধনে আবদ্ধ মানুষ কোথা হইতে পাইবে? কবি বলিতেছেন, "আমি গান গাব 'ভয় নেই'", সেই অভয় মঙ্গল-গানই সীমাবদ্ধ মনের ভীরুতা দুর্বলতা দূর করিয়া দিবে, অসীমকে উপলব্ধির শক্তি চিত্তে সঞ্চার করিবে, অসাড়তা মুক্ত করিবে। এই গানই শিবম্।

গানের অভয় শিবম্ মন্ত্রে মহাকালের তালে তাল দিবার বল পাওয়া যায়, মহাকালের তালে তাল মিলাইতে পারিলে

যে আনন্দের অনুভূতি হয় তাহাতে জয়-সংগীত আপনিই উৎসারিত হইয়া উঠে।

আর গতিই রথযাত্রা। এই গতি এই ধাবনের ভিতরেই রহিয়াছে অদ্বৈতমের অনুভূতি, এই যাত্রাপথ অনন্তের পথ, অসীমের উপলব্ধির পথ।

কবির প্রথম-যৌবনের কবিতায় পর পর তাল, গান ও গতির মধ্যে শান্তম্ শিবমদ্বৈতমের অনুভূতি আরম্ভ

কবির সন্ধ্যাসংগীতে পর পর তাল, গান ও গতির পরিকল্পনা প্রস্ফুটিত হয় নাই। ইহার পর প্রভাতসংগীতে তাল, গান ও গতির ভিতর শান্তম্ শিবম্ অদ্বৈতমের ভাব প্রস্ফুটিত হইতে দেখা যায়।

কবি নিজের তরুণ-বয়সের কথা উল্লেখ করিয়া 'বঙ্গভাষার লেখক' গ্রন্থে বলিয়াছেন,

সে যখন একদিন হাট করিতে বাহির হইয়াছিল তখন বিশ্বমানবের মধ্যে সে আপনার সফলতা চায় নাই—সে আপনার ঘরের সুখ ঘরের সম্পদের জন্যই কড়ি সংগ্রহ করিয়াছিল। কিন্তু সেই মেঠো পথ সেই ঘোরো সুখদুঃখের দিক হইতে কে তাহাকে জোর করিয়া পাহাড়-পর্বত-অধিত্যকা-উপত্যকার দুর্গমতার মধ্য দিয়া টানিয়া লইয়া যাইতেছে।

একদা প্রথম প্রভাতবেলায়
সে পথে বাহির হইনু হেলায়,
মনে ছিল দিন কাজে ও খেলায়
কাটায়ে ফিরিব রাতে।

প্রথমে তাঁহার ভাবগুলি যে-সকল সীমার মধ্যে প্রস্ফুটিত হইতেছিল ক্রমে ধীরে ধীরে সেই সীমার ভিতরে অবচেতনে

এক অসীমের অনুভূতির বিকাশ হইল। এই সীমার বন্ধন তাঁহাকে যে পীড়া দিতেছিল তাহাও তাঁহার প্রথম যুগের রচনায় অনেক স্থলে অভিব্যক্ত হইয়াছে। "হৃদয়ের গীতধ্বনি," "দুঃখ আবাহন", "হলাহল" প্রভৃতি কবিতায় আমরা সেই বন্ধন-বেদনার পরিচয় পাই। অন্যের মনে তাঁহার কবিতা আনন্দের ঝংকার তুলিবে এ আকাঙ্ক্ষার আভাসও এই সব কবিতাতে পাওয়া যায়, যেমন :

বড় ভয় হয় পাছে কেহই না দেখে তারে
যে জন কিছুই শেখে নাই,
ওগো সখা ভয়ে ভয়ে তাই
যাহা জানি সেই গান গাই,
তোমাদের মুখপানে চাই।

যে রাগ শিখায়ে ছিলে সে কি আমি গেছি ভুলে,
তার সাথে মিলিছে না সুর ?
তাই কি আস না প্রাণে, তাই কি শোন না গান,
তাই সখী রয়েছ কি দূর ?

ক্রমে এই সীমার বন্ধন কাটিয়া যাইতেছে, অসীমের উপলব্ধির সূচনা হইতেছে। অবচেতন মনে তাঁহার যে এক নূতন প্রেরণা জাগিয়া উঠিতেছে, "নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গে" আমরা তাহার ইঙ্গিত পাই :

জগতে ঢালিব প্রাণ,
গাহিব করুণা গান,
উদ্বেগ অধীর হিয়া
সুদূরসমুদ্রে গিয়া
সে প্রাণ মিশাব।

"নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গে"র এই বর্ণনায় 'জগতে ঢালিব প্রাণ' এই ছত্রের মধ্যে একটি শাস্ত তালের ইঙ্গিত ও 'গাহিব করুণা গান' এই ছত্রে গানের ইঙ্গিত আছে, করুণা গানে শিবম্ মন্ত্রও রহিয়াছে, সুদূর সমুদ্রে প্রাণ মিশাইতে যাওয়াতে একাধারে গতি ও অদ্বৈতম্ সূচিত হইতেছে।

"প্রতিধ্বনি" কবিতাতেও পর পর তাল, গান ও গতির পরিকল্পনা আছে এবং সেই তাল, গান ও গতিতে শান্তম্ শিবম্ ও অদ্বৈতম্ মন্ত্র ধ্বনিত হইয়াছে।

আলোকের পদধ্বনি মহা অন্ধকারে
ব্যাপ্ত করি বিশ্ব চরাচর,
পৃথিবীর, চন্দ্রমার, গ্রহ তপনের
কোটি কোটি তারার সংগীত
তোর কাছে জগতের কোন্ মাঝখানে
না জানি রে হতেছে মিলিত।

বিশ্বচরাচর ব্যাপ্ত করিয়া মহা অন্ধকারের ভিতর আলোকের পদধ্বনি তালের ইঙ্গিত প্রকাশ করিতেছে। মহা অন্ধকারের বিভীষিকা ও বিক্ষেপের ভিতর সেই পদধ্বনি আলোকের আগমনীর দ্বারা সামঞ্জস্য সূচিত করিতেছে মহা অন্ধকারের ভিতর এই আলোকের পদধ্বনি শান্তম্ ভাবের প্রকাশক, পৃথিবী চন্দ্রমা ও কোটি কোটি তারার সংগীত শিবম্ রূপে মঙ্গল বর্ষণ করিতেছে এবং গ্রহনক্ষত্রাদির সমবায়ে বিশ্বজগতে একটি প্রেমের সম্বন্ধও সূচিত হইয়াছে।

কবি "প্রতিধ্বনি" কবিতা সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,

প্রতিধ্বনি কবিতা লিখেছিলুম যখন প্রথম গিয়েছিলুম দার্জিলিঙে। যে ভাবে তখন আমাকে আবিষ্ট করেছিল সেটা এই যে, বিশ্বসৃষ্টি হচ্ছে একটা ধ্বনি, আর সে প্রতিধ্বনিরূপে আমাকে মুগ্ধ করছে, ক্ষুব্ধ করছে, আমাকে জাগিয়ে রাখছে, সেই সুন্দর সেই ভীষণ। সৃষ্টির সমস্ত গতিপ্রবাহ নিত্যই একটা কেন্দ্রস্থলে গিয়ে পড়ছে আর সেখান থেকে প্রতিধ্বনিরূপে নির্ঝরিত হচ্ছে আলো হয়ে রূপ হয়ে ধ্বনি হয়ে।

"প্রতিধ্বনি" কবিতা 'প্রভাতসংগীত' পুস্তকে আছে। যখন তিনি প্রভাতসংগীত রচনা করেন তাঁহার সে-সময়ের মনের ভাব রবীন্দ্র-রচনাবলী প্রথম খণ্ডে কবির ভণিতায় প্রকাশ করিয়াছেন:

সেই সময়কার কথা মনে পড়ছে যখন কোথা থেকে কতকগুলো মত মনের অন্দরমহলে জেগে উঠে সদরের দরজায় ধাক্কা দিচ্ছিল। ঐগুলো হচ্ছে অনন্ত জীবন, অনন্ত মরণ, প্রতিধ্বনি। অনন্ত জীবন বলতে আমার মনে এই একটা ভাব এসেছিল, বিশ্বজগতে আসা এবং যাওয়া দুটোই থাকারই অন্তর্গত, ঢেউয়ের মতো আলোতে ওঠা এবং অন্ধকারে নামা। ক্ষণে ক্ষণে হাঁ এবং ক্ষণে ক্ষণে না নিয়ে এই জগৎ নয়, বিশ্বচরাচর গোচর-অগোচরের নিরবচ্ছিন্ন মালা গাঁথা।

এই ব্যাখ্যার ভিতরেও ত্রয়ী পরিকল্পনার মূর্তি রহিয়াছে। কবির মনে একটা ভাব আসিয়াছিল যে বিশ্বজগতে আসা যাওয়া ঢেউয়ের মত আলোতে ওঠা এবং অন্ধকারে নামা। এই যে জন্ম-মৃত্যু আসা-যাওয়ায় ঢেউয়ের কল্পনা এটি তালের পরিকল্পনা। কবি বলিয়াছেন, বিশ্বসৃষ্টি হইতেছে একটা ধ্বনি আর সেই ধ্বনি প্রতিধ্বনিরূপে কবিকে মুগ্ধ করিতেছে, এই ধ্বনিই গান। সৃষ্টির সমস্ত গতিপ্রবাহ নিত্যই একটা কোনো কেন্দ্রস্থলে গিয়া পড়িতেছে, ইহাই গতি।

আমরা বলিয়াছি, শান্তম্ শিবম্ অদ্বৈতম্ উপনিষদের এই মহান্ বাণী তাল, গান ও গতির ভিতর latent content রূপে রহিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার পিতৃদেবের নিকট হইতে এই মন্ত্র পাইয়াছিলেন। "আশ্রম-বিদ্যালয়ের সূচনা" প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন যে, মহর্ষি বলিয়াছিলেন, তোমরা কিছু ভেবনা, ওখানকার জন্য কোনো ভয় নেই, ওখানে শান্তম্ শিবমদ্বৈতমের প্রতিষ্ঠা করে এসেছি।

পিতামাতার আদর্শই শিশুমনে বৃহৎ অহংএর বীজ রোপণ করে

কবির অন্তরে যে আর-একজন কবি বিরাজ করিতেছেন যিনি তাঁহার সমস্ত রচনাকে এবং তাঁহার জীবনকেও প্রতিনিয়ত এক অখণ্ড তাৎপর্যে পরিপূর্ণতা দান করিতেছেন, কবি বার বার তাঁহার উল্লেখ করিয়াছেন। তিনিই কবির জীবনদেবতা, তিনিই কবির শ্রেষ্ঠ অহং। কবি যখন তাঁহার নিজের ব্যক্তিগত ভাব লইয়া কবিতা ছন্দে গাঁথিতেছেন তখন কোথা হইতে এক অসাধারণ অসীম ভাবময় ছন্দ আসিয়া তাহাকে বিশ্বানুভূতিতে পরিপূর্ণ করিয়া তোলে।

বলিতেছিলাম বসি একধারে
আপনার কথা আপন জনারে,
শুনাতেছিলাম ঘরের দুয়ারে
ঘরের কাহিনী যত,

তুমি সে ভাষারে দহিয়া অনলে,
ডুবায়ে তাহারে নয়নের জলে
নবীন প্রতিমা নবকৌশলে
গড়িলে মনের মতো।

কবি বলিয়াছেন,

এই শ্লোকটার মানে বোধ করি এই যে, যেটা লিখিতেছিলাম সেটা সাদা কথা, সেটা বেশি কিছু নয়,—কিন্তু সেই সোজা কথা সেই আমার নিজের কথার মধ্যে এমন একটা সুর আসিয়া পড়ে যাহাতে তাহা বড়ো হইয়া ওঠে। সেই যে সুরটা সেটা তো আমার অভিপ্রায়ের মধ্যে ছিল না ; আমার পটে একটা ছবি দাগিয়াছিলাম বটে কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে যে একটা রং ফলিয়া উঠিল সেই রং ও সে রঙের তুলি তো আমার হাতে ছিল না।

নূতন ছন্দ অন্ধের প্রায়
ভরা আনন্দে ছুটে চলে যায়,
নূতন বেদনা বেজে উঠে তায়
নূতন রাগিণী ভরে।
যে কথা ভাবিনি বলি সেই কথা,
যে ব্যথা বুঝি না জাগে সেই ব্যথা,
জানি না এনেছি কাহার বারতা
কারে শুনাবার তরে।

আমি ক্ষুদ্র ব্যক্তি যখন আমার একটা ক্ষুদ্র কথা বলিবার জন্য চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিলাম তখন কে একজন উৎসাহ দিয়া কহিলেন, "বল বল তোমার কথাই বল। ঐ কথাটার জন্য সকলেই হাঁ করিয়া তাকাইয়া আছে।" এই বলিয়া তিনি শ্রোতৃবর্গের দিকে চাহিয়া চোখ টিপিয়া স্নিগ্ধ কৌতুকের সঙ্গে একটুখানি হাসিলেন এবং আমারই কথার ভিতর দিয়া কি সব নিজের কথা বলিয়া লইলেন।

কে কেমন বোঝে অর্থ তাহার,
কেহ এক বলে কেহ বলে আর,
আমারে শুধায় বৃথা বার বার
দেখে তুমি হাস বুঝি।

শুধু কি কবিতা লেখার একজন কর্তা কবিকে অতিক্রম করিয়া তাঁহার লেখনী চালনা করিয়াছেন? তাহা নহে। সেই সঙ্গে ইহাও দেখিয়াছি যে, জীবনটা যে গঠিত হইয়া উঠিতেছে তাহার সমস্ত সুখদুঃখ তাহার সমস্ত যোগ বিয়োগের বিচ্ছিন্নতাকে কে একজন একটি অখণ্ড তাৎপর্যের মধ্যে গাঁথিয়া তুলিতেছেন।

এই "কে একজন" কবির অন্তরের বৃহৎ অহং। কবি এখানে নিজের সীমাবদ্ধ অহং ও বৃহৎ অহং উভয়ের কথাই বলিয়াছেন এবং সেই বৃহৎ অহং তাঁহার স্বপ্নচৈতন্যের ভিতর দিয়া অবচেতন মনে নিয়ত প্রেরণা দান করিয়া কবির সমস্ত রচনাগুলিকে কি ভাবে এক অখণ্ড তাৎপর্যের সূত্রে গাঁথিয়া তুলিতেছেন এবং শুধু রচনাই নয় সেই সঙ্গে তাঁহার জীবনকেও সেই তাৎপর্যের সহিত এক করিয়া গড়িয়া তুলিতেছেন সে-কথাও বলিয়াছেন। এই বৃহৎ অহংকে কবি বহুভাবে অনুভব করিয়াছেন, বহুনামে অভিহিত করিয়াছেন।

অহং ও বৃহৎ অহং সম্বন্ধে মনোবিজ্ঞানশাস্ত্রের সাধারণ একটি সিদ্ধান্ত এই যে পিতামাতার আদর্শই শিশুর মনে এই বৃহৎ অহংএর বীজ রোপণ করে এবং সেই আদর্শের প্রেরণাতেই এই বীজ অঙ্কুরিত ও ক্রমশ বিকশিত হয়।

কবির বাল্যজীবনী আলোচনা করিলে আমরা কবির অন্তরে কি ভাবে শ্রেষ্ঠ অহংএর বীজ রোপিত, অঙ্কুরিত ও ক্রমবিকশিত হইয়াছিল তাহার পরিচয় পাই।

রবীন্দ্রনাথ 'মানুষের ধর্মে' লিখিয়াছেন, "পিতার কাছে গায়ত্রী মন্ত্রের ধ্যানের অর্থ পেয়েছি তখন আমার বয়স বারো বৎসর।" পিতৃদেবের নিকট হইতেই রবীন্দ্রনাথ উপনিষদের বাণীর মর্মার্থ নিজের মনের ভিতর গভীর ভাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন। সপ্ততিবর্ষপূর্তি উৎসবের অভিনন্দনের প্রতিভাষণে কবি লিখিয়াছেন,

ঈশোপনিষদের যে মন্ত্রে পিতৃদেব দীক্ষা পেয়েছিলেন সেই মন্ত্রটি বার বার নূতন নূতন অর্থ নিয়ে আমার মনে আন্দোলিত হয়েছে বার বার নিজেকে বলেছি তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ মা গৃধঃ—আনন্দ করো তাই নিয়ে যা তোমার কাছে সহজে এসেছে যা রয়েছে তোমার চারিদিকে তারই মধ্যে চিরন্তন, লোভ কোরো না। কাব্যসাধনার এই মন্ত্র মহামূল্য।

রবীন্দ্রনাথের কাব্যসাধনায় উপনিষদের বাণীর প্রেরণা নানাভাবে মূর্তিপরিগ্রহ করিয়াছে। "সীমার ভিতর অসীম" উপনিষদ হইতেই কবির মনে জাগ্রত হইয়াছিল কবির উক্তি হইতেই ইহা আমরা জানিতে পারি। রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন,

উপনিষদ বলেন অসম্ভূতি ও সম্ভূতিকে এক করে জানলেই তবে সত্য জানা হয়। অসম্ভূতি যা অসীম অব্যক্ত, সম্ভূতি যা দেশে কালে অভিব্যক্ত। এই সীমায় অসীমে মিলে মানুষের সত্য সম্পূর্ণ।—'মানুষের ধর্ম,' পৃ. ৮৯

এখানে উপনিষদের আর-একটি বাণীর উল্লেখ করিতেছি যে বাণী রবীন্দ্রনাথের কাব্যসাধনার ভিতর তাঁহার অজ্ঞাতে তাঁহার সমস্ত রচনার মধ্যে এক অখণ্ড তাৎপর্য-গ্রন্থনের সূত্রস্বরূপে রহিয়াছে, সে বাণী শান্তম্ শিবম্ অদ্বৈতম্।

শান্তিনিকেতনে উপদেশ-ভাষণে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন,

সংসারের সমস্ত ঘাতপ্রতিঘাত কাড়াকাড়ি মারামারি যাতে একান্ত হয়ে উত্তপ্ত হয়ে না ওঠে সে-জন্য এক জায়গায় শান্তম্ শিবমদ্বৈতমের সুরটিকে বিশুদ্ধভাবে

জাগিয়ে রাখবার জন্য তপোবনের প্রয়োজন। সেখানে ক্ষণিকের আবর্ত নয়, সেখানে নিত্যের আবির্ভাব, সেখানে পরস্পরের বিচ্ছেদ নয়, সেখানে সকলের সঙ্গে যোগের উপলব্ধি।—'শান্তিনিকেতন', দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৪৮

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে প্রকাশিত Cultural Heritage of India গ্রন্থে "Soul of India" প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ শান্তম্ শিবমদ্বৈতমের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা করিয়া যাহা লিখিয়াছেন তাহার মর্মার্থ এই: "ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করিয়াছি বলিয়া যে আমি এই দেশকে ভালোবাসি তাহা নয়; ভালোবাসি তাহার কারণ, ভারতবর্ষ যুগে যুগে ঝঞ্জাবিক্ষোভের মধ্যেও তাহার মহৎ সন্তানদের এই প্রাণময়ী বাণীকে রক্ষা করিয়াছে:

সত্যম্ জ্ঞানম্ অনন্তম্
শান্তম্ শিবমদ্বৈতম্

ব্রহ্মের মধ্যে শান্তি, ব্রহ্মের মধ্যেই মঙ্গল, ব্রহ্মেই সকলের ঐক্য নিহিত।"

রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন,

এই মন্ত্রের ভাব অনুভূতিতে গ্রহণের দ্বারা এই দেশের অধিবাসীগণ জীবনযাপনে ব্রহ্মের সহিত যুক্ত হইবে, সকলের মধ্যে যে গভীর সত্য আছে তাহা অনুধাবন করিবে এবং নিজ নিজ সকল কর্মের কর্মফল ব্রহ্মকে অর্পণ করিবে।

"ধর্ম" পুস্তকে রবীন্দ্রনাথ শান্তম্ শিবমদ্বৈতমের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম এইরূপ:

প্রথমে শান্তম্। সংসারের সমস্ত ওঠাপড়া ভাঙাগড়া হানাহানি ও বিপ্লবের ভিতরেও বিশ্বের গতি এমন এক নিয়মের দ্বারা বিধৃত হইয়া সুশৃঙ্খলায় পরিচালিত হইতেছে যাহাতে বিশ্ব চিরনবীন রহিয়াছে। বিশ্বের এই দৃশ্যমান প্রচণ্ডতা ও

অসামঞ্জস্যের ভিতরে সামঞ্জস্যরূপে যিনি রহিয়াছেন তিনিই শান্তম্, তাঁহারই তালে বিশ্ব আবর্তিত হইতেছে তাই শক্তির উদ্দামতায় সৃষ্টি ধ্বংস হইয়া যাইতেছে না—অসংখ্য বিরুদ্ধ শক্তিকে নিয়মিত করিয়া সকল শক্তির কেন্দ্রস্বরূপে বিরাজিত রহিয়াছেন শান্তম্।

ইহার পর শিবম্। যিনি শান্তম্ তিনিই শিবম্। শান্তম্ জগতের সমস্ত উদ্দাম শক্তিকে কেন্দ্ররূপে ধারণ করিয়া একটি মঙ্গল লক্ষ্যের অভিমুখে পরিচালিত করিতেছেন। যেমন শক্তি-হীনতার ভিতর শান্তি নাই কেননা শান্তম্ সকল শক্তির কেন্দ্রস্বরূপ সেইরূপ কর্মহীন আলস্য ও ঔদাসীন্যে শিবম্ প্রকাশিত হন না, শুভকর্ম সাধনের ভিতরেই শিবমের প্রকাশ।

তিনিই অদ্বৈতম্। পৃথিবীর সমস্ত মিলন সমস্ত ঐক্যের মধ্যে আমরা যে আনন্দ অনুভব করি তাহাতে সেই অদ্বৈতকে নির্দেশ করিতেছে। আমাদের আকাঙ্ক্ষা জ্ঞানে বা অজ্ঞানে নিয়ত সেই অদ্বৈতমের অভিমুখেই ধাবিত হইতেছে।

আমরা কোন্ সাধনার পথে চলিয়া এই শান্তম্ শিবমদ্বৈতমএর অনুভূতি লাভ করিতে পারি? এখানে আবার সেই সাধারণ অহং ও বৃহৎ অহংএর কথা আসিয়া পড়ে। রবীন্দ্রনাথ 'মানুষের ধর্ম' গ্রন্থে বলিয়াছেন

> আপনাকে বৃহতে উপলব্ধি করাই সত্য অহংসীমায় অবরুদ্ধ বলে জানাই অসত্য।

'প্রতিধ্বনি' কবিতায় পর পর তাল, গান ও গতির ত্রয়ী পরি-কল্পনা যে পর পর শান্তম্ শিবম্ ও অদ্বৈতম্‌কে নির্দেশ করিতেছে এই আলোচনা দ্বারা তাহা আমাদের নিকট স্পষ্টতর হইল আশা করি।

জন্মমৃত্যু আসাযাওয়ার ঢেউ তাল, এই তালের কেন্দ্রে আছেন শান্তম্। বিশ্বসৃষ্টি একটা ধ্বনি অর্থাৎ গান, গানের ন্যায় সহজ ভাবে সৃষ্টির বিকাশ হইতেছে পরিপূর্ণ সৌন্দর্যের প্রকাশের ভিতর দিয়া। আর বিশ্বের সমস্ত গতিপ্রবাহ নিত্যই একই কেন্দ্রে গিয়া মিলিত হইতেছে, আবার নূতন নূতন রূপে ফিরিয়া আসিতেছে আবার তাহাতেই গিয়া মিশিতেছে, সেই এক অদ্বৈতম্।

রবীন্দ্রনাথের কবিতায় "ঘরছাড়া"দিগকে আহ্বান

কবি তাঁহার অনেক কবিতায় সেই সকল "ঘরছাড়া"দের আহ্বান করিয়াছেন যাহারা আপনাকে বৃহতের মধ্যে উপলব্ধি করিবার পথে ধাবিত, যাহারা ব্যক্তিগত ভয়ভাবনা ও স্বার্থচিন্তা হইতে মুক্ত হইয়া নিখিলের মঙ্গলকর্মসাধনের পথে যাত্রা করিবার জন্য অগ্রসর। এই ঘরছাড়ারাই শান্তম্ শিবম্ অদ্বৈতমের প্রকৃত উপাসক। তাহারা দৃঢ়বিশ্বাসে মনে জ্ঞানে অনুভব করিয়াছে যে, পৃথিবীর এই হানাহানি, মৃত্যু ও বিপ্লবের মধ্যেই আছেন শান্তম্ কেন্দ্রস্বরূপে, সুতরাং জগতে ভয় করিবার কিছু নাই। বিশ্বের মঙ্গলকর্মসাধনের পথে যত বাধা বিপত্তিই থাকুক সেই কর্মের কেন্দ্রস্থলে আছেন শিবম্ অতএব বাধা বিপত্তিতে কিসের ভয়? জগতের সমস্ত বিভেদের মধ্যে সেই এক পরমসত্যস্বরূপ রহিয়াছেন অদ্বৈতম্। তাই কবি সেই ঘরছাড়াদের সম্বন্ধে বলিয়াছেন,

> ওদের ঘুম ছুটেছে ভয় টুটেছে একেবারে,
> অলক্ষ্যেতে লক্ষ্য ওদের পিছন পানে তাকায় না রে।

এই ঘরছাড়াদের দেখিয়া মনে বিস্ময় জাগে, মনে হয় ইহারা নিজের অহং‌এর মধ্যে এমন কি মহত্তর অহং‌এর সন্ধান পাইয়াছে যে তাহারই শক্তিতে সব বিপদ দুঃখ ও মৃত্যুকে তুচ্ছ বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারে।

'বলাকা'র একটি কবিতায় সংসারের এই মারামারি কাড়াকাড়ি, স্বার্থান্ধের পরপীড়ন, ভীরুর ভীরুতা, বঞ্চিতের চিত্তক্ষোভ, লোভীর নিষ্ঠুর লোভ প্রভৃতি নানা পাপ ও অমঙ্গলের প্রবল বাধার ভিতর দিয়াও শান্তম্ শিবম্ অদ্বৈতম্ মন্ত্রের সাধকগণ কি ভাবে নির্ভয়ে অগ্রসর হইতে পারে তাহার অপূর্ব ছবি আছে, এখানে সেই কবিতা হইতে কিছু উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল।

যত দুঃখ পৃথিবীর যত পাপ যত অমঙ্গল,
যত অশ্রুজল,
যত হিংসা-হলাহল,
সমস্ত উঠেছে তরঙ্গিয়া
কূল উল্লঙ্ঘিয়া,
ঊর্ধ্ব আকাশেরে ব্যঙ্গ করি।
তবু বেয়ে তরী
সব ঠেলে হ'তে হবে পার
কানে নিয়ে নিখিলের হাহাকার
শিরে লয়ে উন্মত্ত দুর্দিন
চিত্তে নিয়ে আশা অন্তহীন
হে নির্ভীক দুঃখ-অভিহত!

দুঃখেরে দেখেছি নিত্য, পাপেরে দেখেছি নানা ছলে
অশান্তির ঘূর্ণি দেখি জীবনের স্রোতে পলে পলে

মৃত্যু করে লুকোচুরি
সমস্ত পৃথিবী জুড়ি।
ভেসে যায় তারা সরে যায়
জীবনেরে করে যায় ক্ষণিক বিদ্রূপ,
আজ দেখ অভ্রভেদী বিরাট স্বরূপ।
তার পরে দাঁড়াও সম্মুখে
বলো অকম্পিত বুকে,
"তোরে নাহি করি ভয়,
এ সংসারে প্রতিদিন করিয়াছি জয়।
তোর চেয়ে আমি সত্য এ বিশ্বাসে প্রাণ দিব দেখ।
শান্তি সত্য, শিব সত্য, সত্য সেই চিরন্তন এক।"

এখানে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, এই কবিতার প্রথম স্তবকে পর পর তাল, গান ও গতির পরিকল্পনা কিছু প্রচ্ছন্নভাবে আছে অন্যত্র তাল, গান ও গতির ভিতর শান্তম্ শিবম্ অদ্বৈতম্ গূঢ়ভাবরূপে প্রচ্ছন্ন থাকেন এখানে শেষ স্তবকের শেষ ছত্রে স্পষ্টভাবেই তাল, গান ও গতির পরিবর্তে শান্তম্ শিবম্ অদ্বৈতমের উল্লেখ করা হইয়াছে। কবির মনের গূঢ় ভাবটি যেন তাঁহার অজানিতে স্পষ্ট ভাবেই প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। অন্যত্রও দু-এক স্থানেও এইরূপ দেখা যায়, যেমন

দুঃখ পেয়েছি দৈন্য ঘিরেছে অশ্লীল দিনে রাতে
দেখেছি কুশ্রীতারে,
মানুষের প্রাণে বিষ মিশায়েছে মানুষ আপন হাতে
ঘটেছে তা বারে বারে।
তবুও বধির করেনি শ্রবণ কভু,
বেসুর ছাপায়ে কে দিয়েছে সুর আনি,

পরুষ কলুষ ঝঞ্ঝায় শুনি তবু
চিরদিবসের শান্ত শিবের বাণী।

এই কবিতার প্রথম কয়েক ছত্রে তাল ও গান আছে এবং গতিতে পরিসমাপ্তির স্থানে অর্থাৎ অদ্বৈতমের স্থানে "শান্ত শিবের বাণী" দিয়া স্তবকটি সমাপ্ত করা হইয়াছে।

"ঘরছাড়া" কথাটি কবির অতি প্রিয় কথা। তাঁহার অনেক কবিতাতেই এই কথাটির উল্লেখ দেখা যায়। অদ্বৈতমের অভিমুখী গতি বুঝাইবার জন্য এই কথাটি যেন একটি ইঙ্গিতস্বরূপ।

'নটীর পূজা'য় কবি"বন্দনা মোর সংগীতে আজ ভঙ্গীতে বিরাজে" এই যে ইঙ্গিত দিয়াছেন তাহাতেই আমরা বুঝি কবির রচনায় ভঙ্গীর ভিতর দিয়াই তাঁহার বন্দনাসংগীত মূর্তিধারণ করে, পর পর তাল, গানও গতিই এই ভঙ্গী স্বরূপ।

নটীর পূজার নটীও "ঘরছাড়া"-দলেরই একজন। তাহার নৃত্যকলা একদা লোকরঞ্জনের কাজে ছিল, আজ সে পথ ছাড়িয়া তাহার গতি অন্যপথে। নটী এখন নবজন্ম লাভ করিয়াছে। তাহার নৃত্যের ছন্দ এখন আর তাহার চেষ্টাকৃত লোকরঞ্জনের প্রয়াস নয়, এখন

ডাইনে বামে ছন্দ নামে নব জনমের মাঝে
বন্দনা মোর সংগীতে আজ ভঙ্গীতে বিরাজে।

এই নবজন্মের সঙ্গে প্রাণে জাগিয়াছে এক পরম বেদনা—

এ কী পরম ব্যথায় পরান কাঁপায়
কাঁপন বক্ষে লাগে,
শান্তিসাগরে ঢেউ খেলে যায়
সুন্দর তায় জাগে।

আমার সব বাসনা সব কামনা
রচিল এ যে কী আরাধনা।

পরম ব্যথায় যখন শান্তিসাগরের ঢেউয়ের তালে নিজের বক্ষকম্পনের তাল মিশিয়া যায় তখনই সুন্দর অর্থাৎ শিবম্ জাগ্রত হন। আজ নটীর সব বাসনা, সব কামনা একত্রে মিশিয়া একই পরম আরাধনা রচনা করিয়াছে।

এখানে শান্তিসাগরের ঢেউয়ে তাল ও শান্তম্, সুন্দরে শিবম্ এবং সব বাসনা কামনা এক হইয়া কি এক আরাধনা রচনা করায় অদ্বৈতম্ সূচিত হইয়াছে।

মনস্তত্ত্বের দিক দিয়া Sublimationএর স্বরূপ

অতি অল্প বয়স হইতেই কবির মনে শান্তম্ শিবমদ্বৈতমের গূঢ় অনুভূতি অন্তর্নিহিত ভাবে ছিল। কবির কিশোর বয়সের একটি কবিতা এখানে উদ্ধৃত করিতেছি। এই কবিতাটিতেও ত্রয়ী পরিকল্পনা আছে। কবিতাটি ১২৮৪ সালের মাঘ মাসে ভারতী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়, রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন ষোল বৎসর পূর্ণ হয় নাই।

যখনি গো নিশীথের শিশিরাশ্রু জলে
ফেলিতেন উষাদেবী সুরভি নিশ্বাস,
গাছপালা লতিকার পাতা নড়াইয়া
ঘুম ভাঙাইয়া দিয়া ঘুমন্ত নদীর
যখনি গাহিত বায়ু বন্য গান তার
তখনি বালক কবি ছুটিত প্রান্তরে
দেখিত ধানের শীষ দুলিছে পবনে।

তাঁহার কৈশোরের ক্রীড়ার ভিতর আনন্দলাভের প্রবৃত্তি বিশ্বপ্রকৃতির আনন্দক্রীড়ায় যুক্ত হইয়াছে। কিশোর কবি প্রাকৃতিক দৃশ্যের অপার আনন্দের ভিতব নিজেকে প্রতিফলিত দেখিতেছেন, তাহাতে তাঁহার আত্মোপলব্ধি ও আত্মপ্রকাশ উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে।

নরনারীর পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ লইয়া অনেক কবিতা রচিত হইয়াছে। এই আকর্ষণ বা প্রেমেরও দুটি স্তর আছে, একটি স্তরে প্রধানতঃ দৈহিক কামজ আকর্ষণেরই প্রাধান্য, sublimationএ এই কামজ আকর্ষণই ক্রমশঃ উন্নত হইয়া এত উন্নত স্তরে উত্তীর্ণ হইতে পারে যেখানে ব্যক্তিগত ভোগের বাসনা একেবারে মুছিয়া গিয়া তাহা এক অপার্থিব ভাবরূপে মানুষের উচ্চপথের অনুপ্রেবক এবং আত্মোপলব্ধি ও আত্মপ্রকাশের সহায় হয়।

রবীন্দ্রনাথের যৌবনে লেখা কবিতায় দৈহিক মিলনের বর্ণনা কিছু কিছু পাওয়া যায়। "বাহু", "চরণ", "দেহের মিলন, শ্রান্তি," "বিরহ" ও "বন্দী" প্রভৃতি কবিতায় দেহজ আকর্ষণের আভাস পাওয়া যায় কিন্তু সে আকর্ষণ যেন তাঁহাকে পীড়াই দিতেছে। তিনি নিজেকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন,

প্রণয় অমৃত একি? এ যে ঘোর হলাহল।
দূরে যাও, দূরে যাও, হৃদয় রে দূরে যাও,
ভুলে যাও, ভুলে যাও, ছেলেখেলা ভুলে যাও।
দূর করো, দূর করো বিকৃত এ ভালবাসা,
জীবনদায়িনী নহে এ যে গো হৃদয়নাশা।

ক্রমশ এই প্রেম sublimationএ দেহাতীত ভাবের অভিমুখী হইয়াছে :

এ মোহ কদিন থাকে, এ মায়া মিলায়,
কিছুতে পারে না আর বাঁধিয়া রাখিতে।
কোমল বাহুর ডোর ছিন্ন হয়ে যায়
মদিরা উথলে না কো মদির আঁখিতে।

আবার—

কাছে গেলে রূপ কোথা করে পলায়ন
দেহ শুধু হাতে আসে শ্রান্ত করে হিয়া।
প্রভাতে মলিন মুখে ফিরে যাই গেহে,
হৃদয়ের ধন কভু ধরা যায় দেহে ?

নরনারীর প্রেমের রূপ ক্রমশ অন্যভাবে দেখা দিয়াছে :

এ নহে খেলার ধন যৌবনের আশ,
বোলো না ইহার কানে আবেশের বাণী,
নহে নহে এ তোমার বাসনার দাস
তোমার ক্ষুধার মাঝে আনিয়ো না টানি।
এ তোমার ঈশ্বরের মঙ্গল আশ্বাস
স্বর্গের আলোক শুধু এই মুখখানি।

নরনারীর প্রেমের নানাভাবে sublimation হইয়াছে তাহার দৃষ্টান্ত আমরা রবীন্দ্রনাথের কবিতায় বহুস্থলে পাই। এই sublimation এর বর্ণনার মধ্যে ত্রয়ী পরিকল্পনা বহুস্থানে আছে। যেমন "নির্ঝরিণী", "লীলাসঙ্গিনী", "মানসসুন্দরী", "প্রেমের অভিষেক" প্রভৃতি কবিতা।

তোমার আমার দেহে আদি ছন্দ আছে অনাবিল
আমাদের মিল।
তোমার আমার মর্ম মাঝে
একটি সে মূল সুর বাজে,
প্রবাহ তাহার অন্তঃশীল।

বহ্নিবীণা বক্ষে লয়ে দীপ্তকেশে উদ্বোধিনী বাণী
সেপদ্মের কেন্দ্রমাঝে নিত্য রাজে তারে আমি জানি।

হের জাগে সে যে রাতের প্রহর গণি,
তোমার বিজয়শঙ্খ উঠুক ধ্বনি।
গর্জ্জিত তব তর্জন ধিক্কারে
লজ্জিত করো কুৎসিত ভীরুতারে।

পুণ্য অগ্নি জ্বালায়ে রেখেছ অনিবার,
সবিতা যেমন সযতনে, কমলার
চরণ-কিরণে যথা পরিয়াছে হার
সুনির্মল গগনের অনন্ত ললাট,
হে মহিমময়ী মোরে করেছ সম্রাট।

আজিকে এই যে বাজে শাঁখ
এরি মধ্যে আছে গূঢ় তব জয়ধ্বনি,
জিনি লবে তোমার সংসার হে রমণী,
তোমার গৌরবে।

সমস্ত বিশ্বের মর্মে যে চাঞ্চল্য তারায় তারায়
তরঙ্গিছে প্রকাশ ধরায়,
নিখিল ভুবনে নিত্য যে সংগীত বাজে
মূর্তি নিল বনচ্ছায়ে যুগলের সাজে।

তাল

তালের ছদ্মরূপ সম্বন্ধে প্রথমে দুই-চারিটি কথা বলিব।

স্বপ্নচৈতন্যে একটি জিনিস যে অন্য জিনিসের রূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া যায় ইহা আমরা পূর্বেই বলিয়াছি।

একটি কবিতায় আছে,

একটি ফুলের গুচ্ছ আছে রজনীগন্ধার
সেইটি হাতে আঁধার রাতে সাগর হবে পার
আনমনে গান গেয়ে,
কার গলাতে নবীন প্রাতে পরিয়ে দেবে হার।

এই কবিতার শেষ দুই ছত্রে গান ও গতির পরিকল্পনা বেশ স্পষ্ট। কিন্তু তালের পরিকল্পনা একটি রজনীগন্ধা ফুলের গুচ্ছ হাতে লইয়া সাগর পার হওয়া। রজনীগন্ধা ফুলের গুচ্ছে তালের পরিকল্পনা কিরূপে আসিল ?

আর একটি কবিতাতেও রজনীগন্ধার উল্লেখ পাইতেছি :

বেড়াক ভাসিয়া
রজনীগন্ধার গন্ধ মদির লহরী
সমীরহিল্লোলে, স্বপ্নে বাজুক বাঁশরী,—

চন্দ্রালোক প্রান্ত হ'তে, তোমার অঞ্চল
বায়ুভরে উড়ে এসে পুলকচঞ্চল
করুক আমার তনু।

এই ত্রয়ীপরিকল্পনাময়ী কবিতায়, সমীরহিল্লোলে রজনীগন্ধার গন্ধ ভাসিয়া আসিতেছে তাহাই এখানে তাল। এই রজনীগন্ধার সহিত অন্য কবিতার রজনীগন্ধাও মিশিয়া গিয়া তালের রূপ ধারণ করিয়াছে।

একই রাত্রে পর পর অনেকগুলি স্বপ্ন দেখিলে অনেক সময় যাহার মধ্যে গূঢ় ভাব প্রচ্ছন্ন আছে এরূপ এক স্বপ্নচিত্র সামান্য পরিবর্তিত হইয়া সম-গূঢ়-ভাব-প্রকাশক অপর স্বপ্নছবির মধ্যে সন্নিবিষ্ট হইয়া থাকে, এখানে সেইরূপ হইয়াছে।

আর একটি ত্রয়ীপরিকল্পনাময়ী কবিতায় আছে,

দিনের রৌদ্রে বাজতে থাকে
যাত্রাপথের সুর.
অনেক দূর সে যে অনেক দূর।

এখানে দিনের রৌদ্রে কিরূপে তালের পরিকল্পনা হইল তাহা বুঝিতে হইলে কবির আর একটি কবিতা স্মরণ করিতে হইবে :

ছায়ারৌদ্র সে দোলায় দোলে
অশ্রান্ত উল্লোলে।

আগের কবিতার 'রৌদ্র' কথাটি 'ছায়ারৌদ্র'কে বুঝাইতেছে।

প্রভাতসূর্য এসেছ রুদ্রসাজে
দুঃখের পথে তোমার তূর্য বাজে
অরুণরশ্মি জ্বালাও চিত্তমাঝে
মৃত্যুর হোক লয়।

এখানে "প্রভাতসূর্য"ও "ছায়ারৌদ্র"কে বুঝাইতেছে।

ছায়ারৌদ্রের মধ্যে তাল রহিয়াছে, কারণ ছায়ারৌদ্রের মধ্যে একটা দোল রহিয়াছে। কবি কখনও বা তালকে দোল বলিয়াছেন, যেমন,

দোল লেগেছে এবার। পাওয়া আর না পাওয়ার মাঝখানে দোল। এক প্রান্তে বিরহ এক প্রান্তে মিলন স্পর্শ করে দুলছে বিশ্বের হৃদয়। পরিপূর্ণ আর অপূর্ণের মাঝখানে এই দোলন। আলোতে ছায়াতে ঠেকতে ঠেকতে রূপ জাগছে জীবন থেকে মরণে মরণ থেকে জীবনে, অন্তর থেকে বাহিরে আবার বাহির থেকে অন্তরে। এই দোলার তালে তাল না মিলিয়ে চললেই রসভঙ্গ হয়।

"কান্নাহাসি"ও দোলা হইয়াছে, কারণ তাহার মধ্যেও দোল আছে, যেমন,

কান্নাহাসির দোল দোলানো পৌষ-ফাগুনের পালা,
তারি মধ্যে চিরজীবন বইব গানের ডালা,--
এই কি তোমার খুশি,—
আমায় তাই পরালে মালা,
সুরের গন্ধ ঢালা।

এই তো তোমার আলোক ধেনু
সূর্য তারা দলে দলে,
কোথায় বসে বাজাও বেণু
চরাও মহা গগন তলে।

এখানে "সূর্য্য তারা দলে দলে" তাল হইয়াছে, কারণ ইহার মধ্যে দোল আছে।

কঠিন কটু যা আছে মোর প্রাণে
গলিতে চায় অমৃতময় গানে।

সব সাধনা আরাধনা মম
উড়িতে চায় পাখির মতন সুখে।

এখানে "কঠিন কটু" এই শব্দের দ্বারা তালের ইঙ্গিত করা হইয়াছে।

পথের দুই পাশে ফুটেছে ফুল,
পাখীরা গান গাহে গাছে,
রাজার মেয়ে আগে এগিয়ে চলে
রাজার ছেলে চলে পাছে।

এখানে "পথের দুই পাশে ফুটেছে ফুল" তাল রূপে পরিকল্পিত হইয়াছে। রাজার মেয়ে ও রাজার ছেলে যে পথ দিয়া যাইতেছে তাহার দুইপাশে ফুলগাছের সারি অর্থাৎ সম-অন্তরালে রোপিত ফুলগাছের শ্রেণী ছিল, তাহাতে যে ফুল ফুটিয়াছে তাহাতে ছন্দের ভঙ্গিমা প্রকাশিত হইতেছে।

মেঘে মেঘে বর্ণচ্ছটা কুঞ্জে কুঞ্জে মাধবী মঞ্জরী,
নির্ঝরে কল্লোল,
তাহারি ছন্দের ভঙ্গে সর্ব অঙ্গে উঠিছে সঞ্চরি
জীবন-হিল্লোল।

"মেঘে মেঘে বর্ণচ্ছটা" "কুঞ্জে কুঞ্জে মাধবী মঞ্জরী" এবং "নির্ঝরে কল্লোল" এই তিনটিই এখানে তাল।

এই প্রকারে তালের নানা ছদ্মরূপ হয়।

তালের ভিতর শান্ত ভাব

মত্ত সাগর দিল পাড়ি গহন রাত্রিকালে
ঐ যে আমার নেয়ে,
ঝড় বয়েছে, ঝড়ের হাওয়া লাগিয়ে দিয়ে পালে
আসছে তরী বেয়ে।

এই কবিতাটিতেও ত্রয়ী পরিকল্পনা আছে। এখানে "গহন রাত্রিকালে" "মত্ত সাগর পাড়ি" দেওয়াই তাল, ঝড়ের শব্দ গান এবং নৌকা বাহিয়া যাওয়া গতি। ইহার পূর্বে যে কবিতাটি উদ্ধৃত হইয়াছে তাহাতেও রাত্রির নিস্তব্ধতার ভিতর সমুদ্র পার হওয়ার কথা আছে।

অন্য একটি কবিতায়ঃ

শুনছ না কি তোমার গৃহদ্বারে
রিনি ঝিনি শিকলটি কে নাড়ে,
এমন ভরা সাঁঝে,
পায়ে পায়ে বাজিয়ো নাকো মল
ছুটো না কো চরণ চঞ্চল

এই কয়েকটি কবিতাতে তালের ভিতর একটি শান্তভাব প্রকাশ হইতেছে। রাত্রির নিস্তব্ধতায় সমুদ্র পার হওয়ায় তালের শান্তভাব এবং মৃদুশব্দে শিকল নাড়ার তালেও তালের শান্ত ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। তাহা ছাড়া আর-একটি কথাও আছে "এমন ভরা সাঁঝে", ইহাও শান্তভাবপ্রকাশক।

গীতাঞ্জলির একটি গানের

আজি শ্রাবণ ঘন গহন মোহে
গোপন তব চরণ ফেলে
নিশার মত নীরব ওহে
সবার দিঠি এড়ায়ে এলে।

এই কয় ছত্রে দুইটি তালের পরিকল্পনা পাওয়া যায়, ইহার পরের ছত্রগুলিতে গান ও গতির পরিকল্পনা আছে।

এই ছত্র কয়টিতে আমরা তালের পরিকল্পনা এই ভাবে পাইতেছি :—শ্রাবণের মেঘাচ্ছন্ন রাত্রি, বারিবর্ষণের উল্লেখ না থাকিলেও তাহা এখানে অপ্রকাশিত তালরূপে আছে। "গোপন তব চরণ ফেলে" চরণের ধ্বনি তাল, কিন্তু তাহা "নিশার মত নীরব" শান্ত, তাহাতে শব্দ-কোলাহল নাই।

বাজে না কি সন্ধ্যাকালে শান্ত সুরে ক্লান্ত তালে
বৈরাগ্যের বাণী ?

এই দুই ছত্রে তাল, ইহার পরে গান ও গতি আছে। এই তালেও শান্তভাব প্রকাশ পাইতেছে।

বনের মন্দির মাঝে তরুর তম্বুরা বাজে,
অনন্তের উঠে স্তবগান,
চক্ষে জল বহে যায় নম্র হল বন্দনায়
আমার বিস্মিত মন প্রাণ।

এখানে "বনের মন্দির মাঝে" "তরুর তম্বুরা"-বাদ্য তাল। তম্বুরার বাদ্য স্বভাবতই শান্তভাবপ্রকাশক, অনন্তের স্তবগানের সহিত মিলিত হইয়া বাদ্যের তাল বিশেষভাবে শান্তভাবপ্রকাশক হইয়াছে।

এইরূপ আরও অনেকগুলি দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়, যেমন,

ঝিল্লী মন্ত্রে শুনাইতে বৈরাগ্যসংগীত
নক্ষত্রসভায়।

কী কথা উঠে মর্মরিয়া বকুল-তরু-পল্লবে,
ভ্রমর উঠে গুঞ্জরিয়া কী ভাষা,
উর্ধ্বমুখে সূর্যমুখী স্মরিছে কোন্ বল্লভে
নির্ঝরিণী বহিছে কোন্ পিপাসা।

শুনেছিনু যেন মৃদু রিনি রিনি
ক্ষীণ কটি ঘেরি বাজে কিঙ্কিনী,
পেয়েছিনু যেন ছায়াপথে যেতে
তব নিশ্বাস-পরিমল।

যমুনা কল্লোল-গানে চিন্তিতের কানে কানে,
কহে কত কী যে,
নদীপারে রক্ত ছবি দিনান্তের ক্লান্ত রবি
গেল অস্তাচলে।

উপরে উদ্ধৃত প্রত্যেকটি কবিতাতেই তালের ভিতর শান্তম্ এর সুর ধ্বনিত হইয়াছে।

তারে যখন আঘাত লাগে
বাজে যখন সুরে
সবার চেয়ে বড় যে গান
সে রয় বহু দূরে।
সকল আঘাত গেলে থেমে
শান্ত বীণায় আসে নেমে
সন্ধ্যা যেমন দিনের শেষে
বাজে গভীর স্বনে।

গানের মধ্যে শিবম্ মন্ত্র

তালের সহিত গান যেমন একাঙ্গীভূত, শান্তম্ ও শিবম্ সেইরূপ এক।

যিনি শান্তম্ তিনিই শিবম্। এই শান্ত-স্বরূপ জগতের সমস্ত উদ্দাম শক্তিকে ধারণ করিয়া একটি মঙ্গল-লক্ষ্যের দিকে লইয়া যাইতেছেন। শক্তি এই শান্তি হইতে উদ্‌গত ও শান্তির দ্বারা বিধৃত বলিয়াই তাহা মঙ্গলরূপে প্রকাশিত।.........

'ধর্ম', "শান্তং শিবমদ্বৈতম্"

যেমন শক্তিহীনতার মধ্যে শান্তি নাই তেমনি কর্মহীনতার মধ্যে মঙ্গলকে কেহ পাইতে পারে না। কর্মসমুদ্র মন্থন করিয়াই মঙ্গলের অমৃত লাভ করা যায়। ভালোমন্দের দ্বন্দ্ব দেব-দৈত্যের সংঘাতের ভিতর দিয়া দুর্গম সংসারপথের দুরূহ বাধাসকল কাটাইয়া তবে সেই মঙ্গল-নিকেতনের দ্বারে গিয়া পৌঁছিতে পারি।

আত্মপরের সংশ্রবেই যত ভালোমন্দ, যত পাপপুণ্য, যত আঘাত-প্রতিঘাত। শান্তি যেমন নানা শক্তিকে যথোচিত ভাবে সংবরণ করিয়া তাহাদের বিবোধ ভঞ্জন করিয়া দেয় তেমনি সংসারে আত্মপরের শতসহস্র সম্বন্ধের জটিলতার মধ্যে কে সামঞ্জস্য স্থাপন করে? মঙ্গল।—'ধর্ম', "শান্তং শিবমদ্বৈতম্"

রবীন্দ্রনাথ কর্মসমুদ্র মন্থন করিয়া মঙ্গললাভ করিবার কথা বলিয়াছেন। তিনি যে কর্মসাধনার মধ্য দিয়া সমস্ত ক্ষতিবিপদ, ক্ষোভ-বিক্ষেপে নিজের অপরাজিত হৃদয়ের মধ্যে মঙ্গলকে ধারণ করিবার কথা বলিয়াছেন, কি সেই শুভকর্ম?

রবীন্দ্রনাথের উক্তি হইতেই ইহার উত্তর আমরা পাই,

যে কর্ম আত্মপরের সহস্র জটিলতার ভিতর সামঞ্জস্যের প্রেমময় শৃঙ্খলা আনয়ন করে, যাহা পরকে আপন করিবার যে প্রেম তাহার দ্বারাই অনুপ্রেরিত সেই কর্মই শুভকর্ম।

কর্মহীনতার ভিতর মঙ্গলের প্রকাশ সম্ভব নয়, শুভকর্মকে অবলম্বন করিয়াই শিব মূর্তিধারণ করেন।

কিন্তু এই শুভকর্মের বিভিন্নরূপ আছে, গীতা বলিয়াছেন, "কর্মের রহস্য অতি গহন।"

বৈজ্ঞানিক বিজ্ঞান-সাধনায় আপনাকে ডুবাইয়া দিয়াছেন, তাহার ফলে পৃথিবীতে নব নব তথ্য আবিষ্কৃত হইতেছে; দার্শনিক দর্শনশাস্ত্রেব দ্বারা মানুষের চিন্তাপ্রণালীতে নূতন নূতন প্রবাহ আনিয়া দিতেছেন; চিকিৎসক তাঁহার শরীরতত্ত্বের গবেষণায় মানুষ যাহাতে রোগের হাত হইতে পরিত্রাণ পায় তাহার নবনব উপায় উদ্ভাবন করিতেছেন—সমস্ত জগৎবাসীই সেই সকল কর্ম-সাধনার ফলভোগী হইতেছে।

কিন্তু আত্মপরের সংঘর্ষের ঘাতপ্রতিঘাত সংসারে নিয়তই চলিতেছে, এই ঘাতপ্রতিঘাতের ভিতর যদি ছন্দোমাধুরীর আবির্ভাব না হয়, স্নেহ, প্রেম, মৈত্রী ও করুণার প্লাবনরূপে আত্ম-পরের ভেদের অসংখ্য বিভিন্নতা ও অসামঞ্জস্য প্লাবিত করিয়া দিয়া পরম সামঞ্জস্য গড়িয়া তোলাই যাহার কাজ, তাহা হইলে পৃথিবীতে শিবমের প্রকাশ কিরূপে সম্ভব হইবে?

নৃত্যের বশে সুন্দর হ'ল
বিদ্রোহী পরমাণু—
পদযুগ ঘিরে জ্যোতি-মঞ্জীরে
বাজিল চন্দ্রভানু।

বিশ্বজগতে বিচ্ছেদ, মৃত্যু ক্ষতি ও বেদনার অবধি নাই, কিন্তু এক প্রেমের আনন্দবীণার ঝংকার জগৎকে এই সকল মৃত্যুক্ষতি

বিচ্ছেদ-বিরোধ ও দুঃখযন্ত্রণার মধ্যেও আনন্দময় করিয়া রাখিয়াছে, তাহাই শিবম্।

বিশ্বকবির সেই আনন্দবীণার ঝংকারের সুরে নিজের হৃদয়-বীণার সুর বাঁধিবার সাধনায় যাঁহারা আপনাকে ডুবাইয়া দিয়াছেন তাঁহাদের সেই জীবনব্যাপী সাধনা, গানের রূপ ধরিয়া কত মরুহৃদয়ে শ্যামলকুঞ্জ গড়িয়া তুলিয়াছে, কত স্বার্থ-জটিলতার গ্রন্থিমোচন করিয়া আত্মপরের বিভেদের মধ্যে এক পরম ঐক্যপ্রবাহ বহাইয়া দিয়াছে; মৃত্যুভয়ে সাহস, শোকে দুঃখে সান্ত্বনা, ক্ষুরধার দুর্গম মনুষ্যত্বের পথে চলিবার প্রেরণা ও তাল দিয়াছে এই গান, কবির সেই গান কি শুভকর্ম নয়?

গান কর্মের প্রতীকরূপে আবির্ভূত হইবার মধ্যে যে-সকল **latent content** আছে তাহার একটির অর্থ বোধ হয় এই যে, আমাদের সকল কর্মই যেন গানের মত স্বতঃ উৎসারিত, আনন্দময় ও প্রাণময় হয়।

ভারতবর্ষের দেবতা বাজিয়েছেন বাঁশি ভারতবর্ষের দেবতা নেচেছেন নাচ, সে-কথা শাস্ত্রে মানেন এমন ধীমান বিদ্বানের অভাব নেই। তাঁরা হয়তো ভাবেন না সেই গান সেই নাচেই সৃষ্টির কাজ আপিসের কাজ হয়ে ওঠেনি।

দেবতারা যে চাপল্যে কুণ্ঠিত হননি, আমি সেই মনোরঞ্জনী চপলতাকে আমার কর্ম-অনুষ্ঠানে আহ্বান করেছি, আমার সৃষ্টিকর্মে বিশ্বসৃষ্টিকর্তার অনুসরণ করতে চেয়েছি। ......আমার অনেক পণ্ডিত বন্ধু এ সমস্তকে শ্রেয় নয় বলে থাকেন, কিন্তু আমি কবি, শ্রেয়ের ঊর্ধ্বে তাঁকে মানি, আনন্দরূপম্ অমৃতম্ যদ্বিভাতি।

—সুরেন্দ্রনাথ দাস গুপ্তকে লিখিত পত্র

জগতের নিরানন্দের ভিতর আনন্দরূপের অমৃতকে নিজের উপলব্ধির ভিতর দিয়া অন্যকে পরিবেশন করাই শুভকর্মের অনুষ্ঠান।

সেই জন্য গানের মধ্য দিয়া কবির বিশ্বমানবকে আনন্দ পরিবেশন কেবল "মনোরঞ্জনী চপলতা" নয়; মনোরঞ্জনী চপলতাও যদি হয়, তবে সৃষ্টিকর্তার যে চপলতায় সৃষ্টির ভিতর শিবম্'এর সুর বাজিয়াছে, তাহার অনুসরণ 'শিবম্' ভিন্ন আর কি হইতে পারে? এখানে একরূপ স্পষ্টভাবেই গানকে শুভকর্ম অনুষ্ঠানে 'শিবম্' মন্ত্র স্বরূপ বলা হইয়াছে।

গীতা বলেছেন, ফলের কামনা ক'রে কর্ম কোরোনা, তার অর্থ এই যে, কর্মদ্বারা যে সত্যকে লাভ করি, ফলকামনা দ্বারা সেই সত্য হ'তে আমরা বঞ্চিত হই। আমাদের কর্ম স্বার্থের জন্য নয়, তার মধ্যে যে দুঃখ আছে তাতেই আনন্দ পাব, । নিজের মধ্যে যে অনন্তের রূপ আছে, সে বলে দুঃখে কি ভয়, সত্যকার দুঃখ সেই খানেই যেখানে সেই রূপ হারিয়ে যায়। এই দুঃখ থেকে মুক্তি পাবার পথ অসীমের ক্ষেত্র, যেখানে সবই যাচ্ছে পরিপূর্ণের দিকে। দিনরাত্রি বিশ্বের স্রোত বয়ে চলেছে। অবরোধকে যদি একান্ত করে না তুলি তা হলে সে আমার যত কলুষ যত কালিমা সব নির্মল করে দেবে। অসীমের সঙ্গে অহংসীমার এই যোগ নিরন্তর রাখ্‌তে হবে। একদিকে শোক, দুঃখ, ক্ষতি, নিরানন্দ, এ অবরোধেরও গৌরব আছে, যদি অসীমের সঙ্গে কল্যাণের সঙ্গে যোগ রক্ষা করে চলতে পারে, নিখিল সত্যের সঙ্গে এই যোগ রক্ষা করে চলাই আমাদের সাধনা।—"আত্মদান", প্রবাসী, ভাদ্র, ১৩৪০

এই যোগ রক্ষা করিয়া চলাই কবির গানের মধ্য দিয়া শিবম্ মন্ত্রের সাধনা। কবি নিজের ব্যক্তিগত অহংজনিত সুখদুঃখের পারে গিয়া যখন সমস্ত জগতের অসীম বেদনাকে অনুভব করিয়াছেন, তখনই তাহার গানে 'শিবম্' মন্ত্র ধ্বনিত হইয়াছে, সে গান তাঁহার নিজের গান হইলেও অহংসীমাকে ছাড়াইয়া গিয়াছে।

নূতন ছন্দ অন্ধের প্রায়
ভরা আনন্দে ছুটে চলে যায়
নূতন বেদনা বেজে ওঠে তায়
নূতন রাগিণী ভরে।

এই বেদনা-বোধের কথা কবির প্রায় সমস্ত কবিতাতেই দেখা যায়।
কবির গান সেই আনন্দের বার্তা আনিয়াছে,

যে আনন্দ আসে ঝড়ের বেশে,
ঘুমন্ত প্রাণ জাগায় অট্ট হেসে।
যে আনন্দ দাঁড়ায় আঁখিজলে
দুঃখব্যথার রক্ত-শতদলে।

কবি গাহিয়াছেন,

দুঃখখানি দিলে মোর তপ্ত ভালে থুয়ে,
অশ্রুজলে তারে ধুয়ে ধুয়ে
আনন্দ করিয়া তারে ফিরাযে আনিয়া দিই হাতে,
দিনশেষে মিলনের রাতে।

কবি সুরের গুরুর কাছে সেই সুর ভিক্ষা চাহিয়াছেন যে-সুর কোলাহলের ঘূর্ণীর বেসুরা কোলাহলের মধ্যে যথার্থ আনন্দের সুর জাগাইয়া তুলিতে পারে।

তোমার সুরে ভরিয়ে নিয়ে চিত্ত
যাব যেথায় বেসুর বাজে নিত্য,
কোলাহলের বেগে
ঘূর্ণি উঠে জেগে
নিয়ো তুমি আমার বীণার সেইখানেই পরীক্ষা।

গানে শিবম্ মন্ত্র ধ্বনিত হইতেছে কিনা তাহার পরীক্ষা সেই কোলাহলের ঘূর্ণির মধ্যেই।

আমার কাছে শুনতে চেয়েছ
গানের কথা
বলতে ভয় লাগে
তবু কিছু বলব।

মানুষের জ্ঞান বানিযে নিয়েছে
আপন সার্থক ভাষা।
মানুষের বোধ অবুঝ, সে বোবা
যেমন বোবা বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড।
সেই বিরাট বোবা—
আপনাকে প্রকাশ করে ইঙ্গিতে
ব্যাখ্যা করে না।
বোবা বিশ্বের আছে ভঙ্গী, আছে ছন্দ
আছে নৃত্য আকাশে আকাশে।

অণু পরমাণু অসীম দেশে কালে
বানিয়েছে আপন আপন নাচের চক্র
নাচছে সেই সীমায় সীমায়;
গড়ে তুলছে অসংখ্য রূপ।

তার অন্তরে আছে বহ্নিতেজের দুর্দম বোধ
সেই বোধ খুঁজছে আপন ব্যঞ্জনা,
ঘাসের ফুল থেকে শুরু করে
আকাশের তারা পর্যন্ত।

মানুষের বোধ যখন বাঁধ মানে না

বাহন করতে চায় কথাকে,—

তখন তার কথা হয়ে যায় বোবা,

সেই কথাটা খোঁজে ভঙ্গী, খোঁজে ইশারা

খোঁজে নাচ, খোঁজে সুর,

দেয় আপনার অর্থকে উলটিয়ে,

নিয়মকে দেয় বাঁকা করে,

মানুষের কাব্যে রয় বোবার বাণী।

মানুষের বোধ যখন বাহন করে সুরকে

তখন বিদ্যুৎচঞ্চল পরমাণুর মতোই

সুর-সংঘকে বাঁধে সীমায়

ভঙ্গী দেয় তাকে।

নাচায় তাকে বিচিত্র আবর্তনে,

সেই সীমায় বন্দী নাচন

দেয় গানে গড়া রূপ।

সেই বোবা রূপের দল মিলতে থাকে

সৃষ্টির অন্দরমহলে,

যেখানে যত রূপের নটী আছে

ছন্দ মেলায় সকলের সঙ্গে

নূপুর-বাঁধা চাঞ্চল্যের

দোলযাত্রায়।

আমি যে জানি

এ-কথা যে-মানুষ জানায়

কাব্যে হোক, সুরে হোক রেখায় হোক

সে পণ্ডিত।

আমি যে রস পাই, ব্যথা পাই,
রূপ দেখি,
এ-কথা যার প্রাণে বলে
গান তারি জন্য,
শাস্ত্রে সে আনাড়ি হলেও
তার নাড়িতে বাজে সুর।
যদি সুযোগ পাও
কথাটা নারদমুনিকে শুধিয়ো,
ঝগড়া বাধাবার জন্যে নয়
তত্ত্বের পার পাবার জন্য সংজ্ঞার অতীতে॥

শ্রীধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে পত্রাকারে লিখিত এই কবিতায় আমরা স্বপ্নচৈতন্যের মধ্য দিয়া রহস্যের এক গভীর ব্যাখ্যা অনুভূতিতে লাভ করি। কবি যে স্বপ্নময় ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া গানের এই ব্যাখ্যা দিয়াছেন আমরা যে সে-ভাব সম্পূর্ণ ধরিতে পারিব এমন ভরসা নাই, তথাপি যাহা কিছু ধরিতে পারিয়াছি তাহাই সংক্ষেপে এখানে লিখিতেছি।

মানুষের জ্ঞান ভাষার সৃষ্টি করিয়াছে। অর্থাৎ মানুষ নিজে যাহা জানে তাহা অন্যকে জানাইবার উপায় স্বরূপে ভাষার সৃষ্টি করিয়াছে। ভাষার সাহায্যেই আমরা বাহিরের বস্তু ও বিষয় সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞানের দ্বারা অর্জিত তথ্যসমূহ অন্যের নিকট প্রকাশ করিয়া নিজ নিজ জ্ঞানের সার্থকতা সম্পাদন করি। কিন্তু বাহিরের জ্ঞানই মানুষের সব জ্ঞান নয়, মানুষের গভীর মনে আর-এক অনুভূতি আছে যাহা জ্ঞানের দ্বারা লব্ধ অনুভবকে ছাড়াইয়া যায়, ইহা বোধ।

কবি বলিয়াছেন, মানুষের অনুভূতি বুদ্ধির পথ ধরিয়া চলে না। অপরকে নিজের অভিজ্ঞতা বুঝাইবার জন্য তাহার ভাষারও প্রয়োজন নাই—সে বোবা, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যেমন বোবা। সেই বিরাট বোবা অর্থাৎ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ভাষা দিয়া আপনাকে ব্যাখ্যা করে না; বোবা বিশ্ব আপনাকে প্রকাশ করে ইঙ্গিতে, বোবা বিশ্বের আপনাকে প্রকাশ করিবার জন্য আছে বিচিত্র ভঙ্গী। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে অণুপরমাণুর যে আকাশে আকাশে নৃত্য তাহা এই ভঙ্গীরই রূপ।

বর্তমান বিজ্ঞান এই নৃত্যের রূপ আবিষ্কার করিবার সাধনা করিতেছে, এই নৃত্যের রূপের ভিতর দিয়াই সে বিশ্বসৃষ্টির রহস্য উদ্‌ঘাটনের পথ খুঁজিতেছে।

নৃত্যের মধ্য দিয়াই বিশ্ব আবর্তিত হইতেছে। অসীম দেশে কালে অণুপরমাণু আপন আপন নৃত্যের চক্র সৃষ্টি করিয়া সেই চক্রের সীমায় সীমায় নৃত্য করিয়া আবর্তিত হইতেছে, সেই আবর্তনে অসংখ্য রূপ গড়িয়া উঠিতেছে। এই সকল অণু-পরমাণুতে বহ্নিতেজের দুর্দম বোধ রহিয়াছে—সেই বহ্নিতেজের দুর্দম বোধই অণুপরমাণুর প্রকৃত সত্ত্বা। সেই বোধ আপনাকে প্রকাশ করিবার পথ খুঁজিতেছে—ঘাসের ফুল হইতে আকাশের তারা পর্যন্ত সবই এই প্রকাশচেষ্টার বিভিন্ন রূপ।

মানুষের অন্তরতম প্রদেশেও এইরূপ দুর্দম বোধ রহিয়াছে। সেই বোধ আপনাকে প্রকাশ করিবার জন্য কথাকে বাহন করিতে চায়, কিন্তু কথা সেই প্রবল বোধকে প্রকাশ করিতে গিয়া বোধের আবেগে অভিভূত হইয়া বোবা হইয়া যায়। কথা তখন আপনাকে প্রকাশ করিবার জন্য, ভঙ্গী, ইশারা, নৃত্য ও সুরের সন্ধান করে।

অনির্বচনীয় বোধকে প্রকাশ করিবার চেষ্টায় কথার অর্থ ওলটপালট হইয়া যায়, ভাষার প্রচলিত নিয়ম সোজা পথ ছাড়িয়া বাঁকা পথে গিয়া পড়ে। মানুষের কাব্য এই বোবার বাণী।

মানুষের বোধ যখন আপনাকে প্রকাশ করিবার জন্য কথা ছাড়িয়া সুরের সাহায্য গ্রহণ করে তখন বিদ্যুৎ-চঞ্চল পরমাণু যেমন নিজ নিজ নৃত্যচক্রের সীমা রচনা করে সেইরূপ সেই বোবা বোধ সুর-সংঘকে সীমায় বাঁধিয়া তাহাকে একটি বিশেষ ভঙ্গী দান করে এবং বিচিত্র আবর্তনে নৃত্যশীল করিয়া তোলে। সুর-সংঘের সেই সীমা-বন্ধনে বন্দী নৃত্যই গানকে রূপ দান করে, সুর-সংঘের সেই সীমার বাঁধনে আবদ্ধ নৃত্যই গান।

ভাষাতীত ভঙ্গীময় এই বিচিত্র রূপের দল সৃষ্টির অন্দরমহলে, অর্থাৎ মনের গভীর স্তরে যেখানে যত রূপের নর্তকী আছে তাহাদের সকলের ছন্দে নিজেদের ছন্দ মিলায়। মিলনের এই চঞ্চলতায় নূপুরনিক্কণের তালের সীমানির্দেশ আছে, দোলা আছে, সকলের রঙে সকলের রং মিশানোও আছে।

'আমি জানি' যে-মানুষ এই কথা জানায় কাব্যে, সুরে অথবা রেখাতেই হোক্, সে পণ্ডিত। এই পণ্ডিতেরা ভঙ্গীর দলের মানুষ নয়। কাব্যে, চিত্রবিদ্যায় অথবা সংগীতশাস্ত্রে তাহাদের গবেষণা-লব্ধ জ্ঞান আছে বটে কিন্তু গানের প্রাণ তাহাদের জন্য নয়। 'আমি বেদনা অনুভব করি, আমি রূপ দেখি' এ-কথা যাহাদের প্রাণ বলে গান তাহাদেরই জন্য। সংগীতশাস্ত্রের নিয়ম সম্বন্ধে অশিক্ষিত হইলেও তাহাদের হৃদয়তন্ত্রীতে সুরের ঝংকার বাজে।

নারদ মুনির ন্যায় যাঁহারা গানের রসে ডুবিয়া আছেন

তাঁহারাই হয়তো এই সংজ্ঞার অতীত সংগীততত্ত্বের পরপারের নির্দেশ দিতে পারেন।

কবির এই ভঙ্গীময় গানের ব্যাখ্যার ভিতর আমরা সেই ভঙ্গীময় স্বপ্নচেতনা রাজ্যের সন্ধান পাই—যেখানে "আছে ভঙ্গী, আছে ছন্দ, আছে নৃত্য আকাশে আকাশে"—যেখানে প্রবল বোবা বোধকে প্রকাশ করিতে গিয়া কথা বোবা হইয়া গিয়া প্রকাশের ব্যাকুলতায় ভঙ্গী ও ইশারার শরণ লয়, যেখানে কথা প্রকাশের একান্ত চেষ্টায় নিজের অর্থকে অতিক্রম করে, ভাষার প্রচলিত নিয়মকে অস্বীকার করে। পর পর তাল, গান ও গতির পরিকল্পনায় কথার এই অর্থ-ব্যতিক্রমের অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

ত্রয়ী পরিকল্পনার মধ্যে Preconscious এবং Unconscious

রবীন্দ্রনাথের অনেক কবিতাই 'স্বপ্নাচ্ছন্ন' অর্থাৎ তাহার প্রকৃত তাৎপর্য অবচেতনার ভিতর প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, ইহা আমরা পূর্বেই বলিয়াছি। কবি নিজের কবিতার মর্মার্থ নিজেই অনেক সময় যেন ধরিতে পারেন না। কবি নিজের কবিতার ব্যাখ্যা করিতে গিয়া এই ভাবের কথাও বলিয়াছেন

কে কেমন বোঝে অর্থ তাহার
কেহ এক বলে কেহ বলে আর,
আমারে শুধায় বৃথা বার বার
দেখে তুমি হাস বুঝি।

গত বৎসর শান্তিনিকেতনে কবি নিজের কবিতা অধ্যাপনা করিতে গিয়াও এই মর্মের কথা বলিয়াছেন।

নিভৃত এ চিত্তমাঝে
নিমেষে নিমেষে বাজে
জগতের তরঙ্গ-আঘাত,
ধ্বনিত হৃদয়ে তাই
মুহূর্ত বিরাম নাই,
নিদ্রাহীন সারা দিনরাত।

সুখ দুঃখ গীতস্বর
ফুটিতেছে নিরন্তর
ধ্বনি শুধু সাথে নাই ভাষা,
বিচিত্র সে কলরোলে
ব্যাকুল করিয়া তোলে
জাগাইয়া বিচিত্র দুরাশা।

এ চির জীবন তাই
আর কিছু কাজ নাই,
রচি শুধু অসীমের সীমা,
আশা দিয়ে, ভাষা দিয়ে,
তাহে ভালবাসা দিয়ে,
গড়ে তুলি মানসী প্রতিমা।

বাহিরে পাঠায় বিশ্ব
কত গন্ধ, কত দৃশ্য,
সঙ্গীহারা সৌন্দর্যের বেশে
বিরহী সে ঘুরে ঘুরে
ব্যথা ভরা কত সুরে
কাঁদে হৃদয়ের দ্বারে এসে,—

সেই মোহমন্ত্র গানে
কবির গভীর প্রাণে
জেগে উঠে বিরহী ভাবনা,
ছাড়ি অন্তঃপুর বাসে
সলজ্জ চরণে আসে
মূর্তিমতী প্রাণের কামনা।

অন্তর বাহিরে সেই
ব্যাকুলিত মিলনেই
কবির একান্ত সুখোচ্ছ্বাস,
আনন্দ মুহূর্তগুলি
তব করে দিনু তুলি
সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাণের প্রকাশ।

—'মানসী', "উপহার"

এই কবিতাটির ভিতর তাল, গান ও গতির পরিকল্পনা অনেকগুলি আছে।

কবিতাটির ব্যাখ্যা উপলক্ষ্যে কবি বলিয়াছেন,

ইংরেজিতে যাকে বলে mystic মানসীর প্রথম কবিতাটি সেই শ্রেণীর। যখন রচনা করি তখন কী মনে করে লিখেছিলাম তা বলা শক্ত। কিছুদিন পরে যখন পিছু ফিরে দেখি তখন অনেক লেখা ঝাপ্‌সা মনে হয়, তার সম্পূর্ণ অর্থ কি তা বলা যায় না।

কবি এই কবিতায় বলিয়াছেন, বাহিরের বিশ্ব যে গন্ধ, গান, দৃশ্য প্রভৃতি তাঁহার অন্তরের দ্বারে প্রবেশার্থীরূপে পাঠাইয়া দেয় সেইগুলি যেন বিরহীর মত তাঁহার অন্তরের সহিত মিলনের আকাঙ্ক্ষায় তাঁহার হৃদয়-দুয়ারে আসিয়া আঘাত করে, আর

বাহিরের সেই মিলন আবেদনের করুণ মোহময় গানে কবির গভীর প্রাণে যে বিরহী ভাবগুলি জাগ্রত হইয়া উঠে সেই মূর্তিমতী কামনাগুলি সলজ্জ চরণে বাহিরের সহিত মিলিত হইবার জন্য বাহির হইয়া আসে—অন্তর ও বাহিরের সেই ব্যাকুল মিলনেই কবির প্রাণের একান্ত আনন্দোচ্ছ্বাস গানের রূপ ধারণ করে।

কবি তাঁহার কবিতায় 'গভীর মনে'র কথা উল্লেখ করিয়াছেন, মনোবিজ্ঞানশাস্ত্রে এই গভীর মন বা অবচেতন মনের দুটি স্তরের কথা আছে। একটি স্তরকে বলা হয় Preconscious, অর্থাৎ স্বল্পগভীর স্তর। যদিও এই স্তরটি নির্জ্জান মনেরই স্তর কিন্তু সম্পূর্ণ অবচেতন নয়, এটির সহিত চেতন মনেরও কিছু কিছু সম্পর্ক থাকে। সুতরাং অবচেতন মনের এই স্তরে যে-সকল ক্রিয়া হয় তাহা সহজেই আমাদের চেতন মনের স্তরে ফুটিয়া উঠে।

এই স্তরের নিম্নে যে গভীর স্তর তাহাকে বলা হয় Unconscious অর্থাৎ নির্জ্জান স্তর। মনের এই স্তরে যে-সকল ক্রিয়া হয় তাহা আমরা সহজ চেতন মনে ধরিতে পারি না।

পর পর তাল, গান ও গতির পরিকল্পনার ভিতরেও কবির মনের এই দুই স্তরের ক্রিয়ার পার্থক্য ধরিতে পারা যায়।

কবির কবিতায় আমরা দেখিতে পাই কবির মনে যেমন তাল, গান ও গতির পরিকল্পনা সৃষ্টি হইতেছে সেই সঙ্গে সেই পরিকল্পনাগুলি বিভিন্ন রূপ ধারণ করিতেছে! তালের পরিকল্পনা ছায়ারৌদ্ররূপে পরিবর্তিত হইতেছে, গানের পরিকল্পনা ফুল ফোটা, রবিরশ্মি, বিচিত্র বর্ণ বা গন্ধের রূপ ধারণ করিতেছে। কবির অবচেতন মনের ক্রিয়ায় এইরূপ হইতেছে কিন্তু কবি

তাহা বুঝিতে পারিতেছেন, কেননা কবির অবচেতন মনের যে স্তরের ক্রিয়ায় এইরূপ হইতেছে সেটি Preconscious স্তর।

আবার ইহাও দেখা যাইতেছে, কবির কবিতায় তাল গান ও গতির ত্রয়ী পরিকল্পনা প্রতীকরূপে প্রস্ফুটিত হইতেছে,—কিন্তু কেন যে ইহা এইভাবে প্রতীকরূপে পর পর ফুটিয়া উঠিতেছে কবি তাহা তাঁহার চেতন মনের অনুভূতিতে ধরিতে পারেন নাই; এমন কি, একটি গভীর ভাবের প্রতীকরূপেই যে তাঁহার কবিতায় এই পর পর তাল, গান ও গতির পরিকল্পনা স্বতঃ প্রস্ফুরিত হইতেছে ইহাও তিনি লক্ষ্য করেন নাই।

তাঁহার কবিতার মর্ম্মস্থলে আছে সীমার ভিতর অসীমের প্রকাশ; ইহা যে তিনি অনুভব করিয়াছেন অনেক স্থলে স্পষ্টভাবেই তাহা ব্যক্ত হইয়াছে কিন্তু সেই সীমার মধ্যে অসীমের সুর যে শান্তম্ শিবমদ্বৈতম্ মন্ত্রের সুরের সহিত একই তানে বাজিয়া একই সুর হইয়া গিয়াছে তাহা তাঁহার চেতন মনে ধরা পড়ে নাই।

অবচেতনায় আধ জাগরণে কবি তাঁহার কবিতায় যে অপূর্ব্ব রস বিতরণ করিতেছেন, বিশ্বজন সেই অপূর্ব্ব রস আস্বাদন করিতেছে, এবং তাহারাও চেতন মনের দিক দিয়া ইহার অর্থ না বুঝিয়াও তাহাদের অবচেতন অনুভবের মধ্য দিয়া এই রস গ্রহণ করিতেছে ও আস্বাদে মুগ্ধ হইতেছে। কবি যেমন বলিয়াছেন, “না বুঝেও আমি বুঝেছি তোমারে কেমনে কিছু না জানি।” কেবল দেশবাসী নয় বিদেশবাসীও কবির রচনার আস্বাদ এইভাবে অনুভবে গ্রহণ করিয়া মুগ্ধ হইয়াছে। বর্ত্তমান মহাযুদ্ধে বিখ্যাত প্যারিস সহর পতনের আগের দিন প্যারিসের

অধিবাসীগণ রেডিয়ো যন্ত্রের সাহায্যে রবীন্দ্রনাথের পোষ্টফিষ নাটিকার অভিনয় শুনিয়া পরম দুঃখের দিনে তাহাদের অন্তরের গভীর বেদনার ভিতর শান্তিলাভ করিবার চেষ্টা করিয়াছিল।

কবি তাঁহার যে বাঁশরীর সুরে বিশ্বজনকে সম্মোহিত করিয়াছেন সে-বাঁশিটি তিনি পাইয়াছিলেন তাঁহার অবচেতন মনের অনুভূতির ভিতরে।

অর্থ কিছু বুঝি নাই, কুড়ায়ে পেয়েছি কবে জানি,
নানা বর্ণে চিত্র-করা বিচিত্রের নর্ম-বাঁশিখানি
যাত্রাপথে।
সে প্রত্যুষে প্রদোষের আলো অন্ধকার
প্রথম-মিলন-ক্ষণে লভিল পুলক দোঁহাকার
রক্ত-অবগুণ্ঠন-ছায়ায়।

ইহার পর কবি জানাইয়াছেন,

গভীরের স্পর্শ চেয়ে ফিরিয়াছি, তার বেশী কিছু
হয় নি সঞ্চয় করা, অধরার গেছি পিছু পিছু।
আমি শুধু বাঁশরীতে ভরিয়াছি প্রাণের নিঃশ্বাস
বিচিত্রের সুরগুলি গ্রন্থিবারে করেছি প্রয়াস
আপনার বীণার তন্ত্রতে। ফুল ফোটাবার আগে
ফাল্গুনে তরুর মর্মে বেদনার যে স্পন্দন জাগে
আমন্ত্রণ করেছিনু তারে মোর মুগ্ধ রাগিণীতে
উৎকণ্ঠা-কম্পিত মূর্ছনায়। ছিন্নপত্র মোর গীতে
ফেলে গেছে শেষ দীর্ঘশ্বাস। ধরণীর অন্তঃপুরে
রবি-রশ্মি নামে যবে তৃণে তৃণে অঙ্কুরে অঙ্কুরে
যে নিঃশব্দ হুলুধ্বনি দূরে দূরে যায় বিস্তারিয়া
ধূসর যবনি-অন্তরালে, তারে দিনু উৎসারিয়া

এ বাঁশির রন্ধ্রে রন্ধ্রে ; যে বিরাট গূঢ় অনুভবে
রজনীর অঙ্গুলিতে অক্ষমালা ফিরিছে নীরবে
আলোক-বন্দনা-মন্ত্র জপে, আমার বাঁশিরে রাখি
আপন বক্ষের পরে তারে আমি পেয়েছি একাকী
হৃদয়-কম্পনে মম ; যে বন্দী গোপন-গন্ধখানি
কিশোর কোরক মাঝে স্বপ্ন-স্বর্গে ফিরিছে সন্ধানি
পূজার নৈবেদ্য ডালি, সংশয়িত তাহার বেদনা
সংগ্রহ করেছে গানে আমার বাঁশরী কলস্বনা।

কবির গানে আছে গভীরের স্পর্শলাভের জন্য ব্যাকুলতা, অধরাকে ধরিবার আকাজ্ক্ষা। গানের ভিতর দিয়াই তিনি বিশ্বজগৎকে দেখিয়াছেন এবং এই গীতিসাধনার ভিতর দিয়াই বিশ্বের বিচিত্ররূপের ভিতর সেই অধরার স্পর্শলাভ করিয়াছেন, —তাই কবি বলিয়াছেন,

গানের ভিতর দিয়ে যখন দেখি ভুবনখানি,
তখন তোমায় চিনি আমি তখন তোমায় জানি।

জগতের নানা রূপে রসে গন্ধে শব্দে দৃশ্যে তাঁহার অন্তর পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতেছে, সেই পরিপূর্ণতা তাঁহাকে যে পরম অনুভূতিতে লইয়া যাইতেছে তাঁহার কবিতায় আমরা গানের বিচিত্ররূপের ভিতর তাহারই পরিচয় পাই। ফুল ফোটানোর ভিতর তরুর যে বেদনার সাধনা তাহাও তাঁহার অনুভবগোচর, তাঁহার গানগুলিও যে বেদনামথিত হৃদয়ে ফুলের মতই ফুটিয়া উঠিয়াছে, কবি তাই গাহিয়াছেন,

ফুল ফোটাবার আগে
ফাল্গুনে তরুর মর্মে বেদনার যে স্পন্দন জাগে
আমন্ত্রণ করেছিনু তারে মোর মুগ্ধ রাগিণীতে
উৎকণ্ঠা-কম্পিত মূর্ছনায়।

ত্রয়ী পরিকল্পনার ভিতর গানের পরিকল্পনা অনেক স্থলেই ফুল-ফোটানো রূপে দেখা দিয়াছে, যেমন,

তোমার বীণায় গান ছিল
আর আমার ডালায় ফুল ছিল,
একই দখিন হাওয়ায় সেদিন
দোঁহায় মোদের দুল দিল ;
সেদিন সে তো জানে না কেউ
আকাশ ভরে কিসের সে ঢেউ,
তোমার সুরের তরী আমার
রঙিন ফুলে কূল নিল।
সেদিন আমার মনে হোলো
তোমার তানের তাল ধরে'
আমার প্রাণের ফুল ফোটানো
রইবে চিরকাল ধরে'।
গান তবু তো গেল ভেসে,
ফুল ফুরাল দিনের শেষে—
ফাগুন বেলার মধুর খেলায়
কোন্‌খানে হায় ভুল ছিল।

এই বর্ণনায় আমরা দেখি, জগতের মধ্যে একটা প্রেমের আদানপ্রদান চলিতেছে, প্রেমিকের প্রেম বীণার গানের রূপে

প্রেমাস্পদার প্রাণে যে আঘাত করিতেছে সেই আঘাতে প্রেমাস্পদার প্রাণ ফুল হইয়া ফুটিয়া উঠিতেছে। কিন্তু এই প্রেমের আদানপ্রদানের ভিতর কোনোখানে ভুল অর্থাৎ স্বার্থগন্ধ থাকিতে পারে, তখন এই ফুল ফোটার অবসান হয়।

কবি বলিতেছেন, ফুল ফোটানোর সময় তরুর মর্মে বেদনার যে স্পন্দন জাগ্রত হয় সেই বেদনাকে তিনি তাঁহার মুগ্ধ রাগিণীতে আহ্বান করিয়াছিলেন "উৎকণ্ঠা-কম্পিত মূর্ছনায়।"

এই উৎকণ্ঠার ভিতর আছে সংশয়—এ ফুল কি বর্ণে গন্ধে মনোহর হইয়া ফুটিয়া উঠিবে? এ ফুল কি পূজার ডালি সাজাইবার যোগ্য হইবে? ফুল ফোটানোর এই আকাঙ্ক্ষার মধ্যে শিবম্ বা মঙ্গলকে লাভ করিবার আকাঙ্ক্ষা রহিয়াছে।

এই ফুল ফোটানোর রাগিণী যেন পৃথিবীর মর্মের সংগীত, সেই সংগীতই কবির রক্তে প্রতিনিয়ত দোলা দিয়া যায়। প্রকৃতির মধ্যে সুন্দরকে বিকশিত করিয়া তুলিবার যে তপস্যা প্রতিনিয়ত চলিতেছে অবচেতন মনের দৃষ্টি দিয়া কবি তাহা প্রত্যক্ষ করিতেছেন :

যে মাটিতে শিউরে ওঠে ঘাস
যার 'পরে ঐ মন্ত্র পড়ে দক্ষিণা বাতাস ;—
চিরদিনের আলোক জ্বালা নীল আকাশের নিচে
যাত্রা আমার নৃত্য-পাগল নটরাজের পিছে।
ফুল ফোটানোর যে রাগিণী বকুল-শাখায় সাধা,
নিষ্কারণে ওড়ার আবেগ চিলের পাখায় বাঁধা
সেই দিয়েছে রক্তে আমার ঢেউয়ের দোলাদুলি,
স্বপ্নলোকে সেই উড়েছে সুরের পাখনা তুলি।

বকুলের শাখায় ফুল ফোটানোর যে রাগিণী নিয়ত অন্তর্নিহিত, এবং গগনচারী চিলের পাখায় যে ওড়ার আবেগ, কবির চোখে এ দুইই এক, বিভিন্নরূপে একেরই প্রকাশ। প্রকৃতিকে গভীর অবচেতন মনের অনুভূতি দিয়া কবি যে কি ভাবে আস্বাদন করিয়াছেন তাহা তাহার কবিতার ছত্রে ছত্রে প্রকাশ পাইয়াছে :

কেটে গেছে বেলা শুধু চেয়ে থাকা মধুর মৈতালিতে
নীল আকাশের ছায়ায় ওদের সবুজ বৈতালিতে।
সকালবেলার প্রথম আলোয়, বিকালবেলার ছায়ায়,
দেহ মন প্রাণ ভরেছে সে কোন্ অনাদি কালের মায়ায়।
পেয়েছি ওদের হাতে—
দূর জনমের আদি পরিচয় এই ধরণীর সাথে।
অসীম আকাশে যে প্রাণ-কাঁপন অসীম কালের বুকে—
নাচে অবিরাম, তাহারি বারতা শুনেছি ওদের মুখে ;
যে মন্ত্রখানি পেয়েছি ওদের সুরে—
তাহার অর্থ মৃত্যুর সীমা ছাড়ায়ে গিয়েছে দূরে।

শেষের স্তবকে ত্রয়ী পরিকল্পনা সুপরিস্ফুট হইয়াছে।

প্রকৃতির সহিত কবির কেবল যে নিবিড় আত্মীয়তা তাহা নয়, প্রকৃতি তাঁহাকে সেই "অসীম আমি"র সন্ধান বলিয়া দেয়,

সে আমি সকল কালে,
সে আমি সকল খানে,
প্রেমের পরশে সে অসীম আমি বেজে ওঠে মোর গানে।

ত্রয়ী পরিকল্পনায় গানের স্থলে ফুল ফোটানোর আরও অনেক উদাহরণ পাওয়া যায় ঃ

মৌন বীণার তন্ত্র আমার জাগাও সুধা রবে।
বসন্তসমীরে তোমার ফুল-ফোটানো বাণী
দিক পরানে আনি,
ডাকো তোমার নিখিল উৎসবে।

বাদল হাওয়ার দীর্ঘশ্বাসে যূথীবনের বেদনা সে,
ফুল-ফোটানোর খেলায় কেন ফুল-ঝরানোর ছল ?

কবি বলিয়াছেন,

ছিন্নপত্র মোর গীতে ফেলে গেছে শেষ দীর্ঘশ্বাস।

ফুল ফোটার সহিত পাতা ঝরার বিশেষ সম্বন্ধ আছে। তাই কবি বলিতেছেন,

ফাগুনের শুরু হ'তেই শুকনো পাতা ঝরল যত
তারা আজ কেঁদে সুধায়
"সেই ডালে ফুল ফুটল কি গো,
ওগো কও ফুটল কত ?"
তারা কয়, "হঠাৎ হাওয়ায় এল ভাসি
মধুরের সুদূর হাসি—হায়
ক্ষ্যাপা হাওয়ায়,
আকুল হয়ে ঝরে গেলাম শত শত।"

কত শুকনো পাতা ক্ষ্যাপা হাওয়ায় আকুল হইয়া ঝরিয়া পড়ে, ফলে, যে ডাল হইতে সে ঝরিয়া পড়ে সেই ডালে ফুল ফুটিয়া ওঠে।

কবি নিজেও এই ঝরাপাতার দলের লোক। পাতা যখন গাছ হইতে খসিয়া পড়িয়া ধূলায় হোলি খেলিতেছে কবি তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন,

ঝরা পাতা গো, আমি তোমারি দলে।
অনেক হাসি অনেক অশ্রুজলে
ফাগুন দিল বিদায়-মন্ত্র
আমার হিয়াতলে।

ফুল ফোটানোর মত ত্রয়ী পরিকল্পনায় পাতা ঝরিয়া যাওয়াও গানের স্থান অধিকার করিয়াছে এরূপ উদাহরণ পাওয়া যায়ঃ

শীতের হাওয়ার লাগল নাচন
আমলকীর এই ডালে ডালে।
পাতাগুলি শিরশিরিয়ে ঝরিয়ে দিল তালে তালে।
উড়িয়ে দেবার মাতন এসে
কাঙাল তারে করল শেষে,
তখন তাহার ফলের বাহার
রইল না আর অন্তরালে।

পাতা ঝরার মধ্য দিয়া বিশ্বজগতে শিবম্ বা মঙ্গলের প্রকাশ ব্যক্ত হইতেছে। আমলকীর ডালের পাতাগুলি ঝরিয়া পড়িতেছে, পাতার সেই আত্মত্যাগের ফলে সেই ডালে ফলের বাহার প্রকাশ হইতেছে। এইরূপ আত্মত্যাগের মধ্য দিয়া বিশ্বজগতে মঙ্গলের প্রকাশই শিবম্।

পাতা ঝরার পর আসে নববিকাশের দিন, রবি-রশ্মি ধরণীর অন্তঃপুরে নামিয়া আসিয়া তৃণে তৃণে অঙ্কুরে অঙ্কুরে জাগরণের সূচনা করিয়া দিল, নবজাতকের শুভজন্মের মাঙ্গল্যসূচক

যে নিঃশব্দ হুলুধ্বনি দূরে দূরে বিস্তার করিয়া গেল কবি সেই হুলুধ্বনিকে তাঁহার বাঁশরীর রন্ধ্রে উৎসারিত করিয়া দিলেন।

রবিরশ্মি বা আলো ত্রয়ী পরিকল্পনায় গানের স্থান অধিকার করিয়াছে :

সাগর যেমন জাগায় ধ্বনি
খোঁজে নিজের রতন-মণি,
তেমনি করে' আকাশ বেয়ে
অরুণ-আলো যায় যে ছেয়ে
নাম ধরে তোর বাজায় বাঁশি
কোন্ অজানা জন।

অরুণ-আলোই এখানে গান ও 'শিবম্' ভাবের দ্যোতক।

অন্যত্র,

এস হে নির্মল
কল-কল ছল-ছল
রবিকর রহে তব প্রতীক্ষায়,
তুমি যে খেলার সাথী, সে তোমারে চায়।
তাহারি সোনার তান
তোমাতে জাগায় গান,
এস হে উজ্জ্বল।

রবিরশ্মি পৃথিবীর জাগরণী সংগীত। তাই কবি বলিয়াছেন,

জানি জানি, শীত, আমার যে গীত
বীণায় নাচে
তারে হরিবারে কভু কি তোমার
সাধ্য আছে ;

দক্ষিণ বায়ে ক'রে যাব দান
রবিরশ্মিতে কাঁপিবে সে তান,
কুসুমে কুসুমে ফুটিবে সে গান
লতায় গাছে।

কবি বলিয়াছেন,

যে বিরাট গূঢ় অনুভবে
রজনীর অঙ্গুলিতে অক্ষমালা ফিরিছে নীরবে
আলোক বন্দনামন্ত্র জপে,—আমার বাঁশিরে রাখি
আপন বক্ষের মাঝে, তারে আমি পেয়েছি একাকী
হৃদয়-কম্পনে মম।

ত্রয়ী পরিকল্পনার মধ্যে গানের পরিকল্পনায় এই মন্ত্র জপের উল্লেখ পাওয়া যায়,—

এক তীর গড়ি তোলে অন্য তীর ভাঙিয়া ভাঙিয়া,
সেই প্রবাহের 'পরে উষা ওঠে রাঙিয়া রাঙিয়া,
কৃষ্ণ রাতে তারা যত
জপ করে ধ্যানমন্ত্র, অস্তসূর্য রক্তিম উত্তরী
বুলাইয়া চলে যায়—

কবি ইহার পর 'গোপন গন্ধে'র উল্লেখ করিয়াছেন, যে গন্ধ গানের নৈবেদ্য সাজাইবার জন্য কিশোর কোরকের মধ্যে বন্দী অবস্থায় স্বপ্নের স্বর্গে উপকরণ সন্ধান করিয়া ফিরিতেছে। ত্রয়ী পরিকল্পনায় গান ও গন্ধে একীকরণ ও গানের গন্ধরূপ ধারণ রবীন্দ্রনাথের কবিতায় বহু স্থানে আছে :

কী বাণী আসে ঐ রয়ে রয়ে,
গোপন কেতকীর পরিমলে,
সিক্ত-বকুলের বনতলে
দূরের আঁখিজল ব'য়ে ব'য়ে।

বর্ষণ-গীত হল মুখরিত মেঘমন্দ্রিত ছন্দে,
কদম্ববন গভীর মগন আনন্দ-ঘন গন্ধে।
দহন শয়নে তপ্ত ধরণী পড়েছিল পিপাসার্তা।
পাঠালে তাহারে ইন্দ্রলোকের অমৃতবারির বার্তা।

সন্ধ্যামালতী সাজে যে ছন্দে
শুধু আপনার গোপন গন্ধে,
যে সাজ নিজেরে ভোলে আনন্দে
সেই সাজে মোরে সাজাও।

ও আমের মঞ্জরী,
আজ, হৃদয় তোমার উদাস হয়ে
পড়ছে কি ঝরি?
আমার গান যে তোমার গন্ধে মিশে
দিশে দিশে
ফিরে ফিরে ফেরে গুঞ্জরি।

গানের এই বিচিত্র রূপ ধারণ কবি স্বপ্নানুভূতির ভিতর দিয়া অনুভব করিয়াছেন—"গৌণরূপে ঈষৎ গোচর।" কিন্তু তাঁহার গভীরতম অনুভূতির কেন্দ্রে যে সমস্ত প্রকাশেরই উৎস-স্বরূপ "শান্তম শিবমদ্বৈতম্" উপনিষদের এই বাণী বিরাজিত, তাহা কবির নিকট অপ্রকাশ রহিয়া গিয়াছে।

"মানসী" সম্বন্ধে আলোচনায় কবি লিখিয়াছেন,

কবির জীবনে আছে দুটো প্রেরণা, একটা ব্যবহারিক দিকের, অন্যটা অসীমের মধ্যে চিরন্তনের দিকে যাত্রার দিকের। ব্যবহারিক দিকের বিষয়ে যখন অসীমের বাণী আসে তখন কাব্য সে-কথা বলে। কবিরা উভচর। একদিকে তিনি চলেন পায়ে, অন্যদিকে তাঁর মন বিচরণ করে ভূমায়।

—'দেশ', ১৫ই ভাদ্র ১৩৪৭

আমরা উপরে কবির এই উভচরত্বেরই একটি দৃষ্টান্ত দিবার চেষ্টা করিয়াছি।

পর পর তাল, গান ও গতির সৃষ্টিকার্যে কবির অবচেতন মনের দুইটি বিভিন্ন স্তরের মধ্যে ক্রিয়া হইতেছে। ইহার একটি স্তর preconscious অর্থাৎ চেতন মনের সন্নিকট, আর একটি unconscious অর্থাৎ অবচেতন মনের গভীরতম স্তর।

যদিও তাঁহার মনের একটি স্তরে তাল, গান, ও গতির রূপ নানা বিচিত্র আকারে সৃষ্টি হইতেছে কিন্তু এই সৃষ্টিকার্যে কেবল এই স্তরেরই ক্রিয়া নাই, তাঁহার মনের আর এক অতি গভীর স্তরের ভাব সকল বৈচিত্র্যের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইতেছে এবং সেগুলিকে নিয়মিত করিতেছে।

এই জন্য রবীন্দ্রকাব্যে ত্রয়ী পরিকল্পনার রূপ অনেকস্থলে এরূপভাবে পরিবর্তিত হইয়া যায় যে সহজে তাহাদিগকে ত্রয়ী পরিকল্পনা বলিয়া ধরিতে পারা যায় না।

বিপরীত ভাব বুঝাইবার ইঙ্গিতে ত্রয়ী পরিকল্পনার উল্টাভাবে প্রকাশ

ত্রয়ী পরিকল্পনা কখনো কখনো বিপরীতভাবে প্রকাশ পায়, অর্থাৎ আগে তাল তাহার পর গান ও তাহার পর গতি না হইয়া আগে গতি পরে গান ও শেষে তাল রহিয়াছে এমনও দেখা যায়, যেমন :

দুর্গম পথের প্রান্তে পান্থশালা 'পরে,
যাহারা পড়িয়াছিল ভাবাবেশ ভরে।
রসপানে হতজ্ঞান, যাহারা নিয়ত,
রাখে নাই আপনারে উদ্যত জাগ্রত।
মুগ্ধ মূঢ় জানে নাই বিশ্বযাত্রীদলে,
কখন চলিয়া গেছে সুদূর অচলে।
বাজায়ে বিজয়শঙ্খ, শুধু দীর্ঘ বেলা,
তোমারে খেলনা করি করিয়াছে খেলা।

এই কবিতায় শেষ চারি ছত্রে ত্রয়ী পরিকল্পনা আছে। বিশ্ব-যাত্রীদলের সুদূর অচলে চলিয়া যাওয়ায় প্রথমেই গতি তাহার পর বিজয়শঙ্খবাদ্যে গান ও শেষে খেলনা লইয়া খেলায় তালের ইঙ্গিত পাওয়া যাইতেছে।

ত্রয়ী পরিকল্পনার বিপরীত প্রকাশে ইহাই বুঝায় যে, পরিকল্পনাটি ঠিকভাবে থাকিলে কবিতার গভীর ভাব যাহা বুঝাইত এখানে তাহার বিপরীত অর্থ বুঝাইতেছে।

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে সকল রচনায় স্বপ্নচৈতন্যের ক্রিয়া আছে সেই সকল রচনার ভিতরেই প্রতীক বা symbol ভঙ্গী

বা ইঙ্গিত স্বরূপে প্রকাশ পায়। মনে করা যাক, স্বপ্নে কয়েকটি ছবি পর পর সাজাইয়া একটি সম্পূর্ণ ভাবাত্মক ছবি গঠন করা হইয়াছে। আমরা স্বপ্ন দেখিতেছি এবং সেই ছবির ভাবের ভিতর দিয়া তাহার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতেছি। হয়তো স্বপ্নের এক অংশে দেখিলাম যে তিনটি, অথবা কয়েকটি জিনিসের ছবি পর পর সাজাইয়া একটি সম্পূর্ণ ছবি করা হইয়াছে, আবার সেই স্বপ্নেরই পরের এক অংশে দেখিলাম পূর্বের জিনিসগুলি সাজাইয়াই আর একটি স্বপ্নচিত্র সৃষ্টি হইয়াছে কিন্তু প্রথমবারের ছবিতে ছবির উপাদানগুলি যেভাবে পর পর সাজানো ছিল এই ছবিতে সেই সাজানো উল্‌টাইয়া গিয়াছে অর্থাৎ পূর্বেকার সাজানোর বিপরীত ভাবে সাজানো হইয়াছে। ইহাতে বুঝিতে হইবে প্রথম স্বপ্নচিত্রের যাহা গূঢ়ভাব পরের স্বপ্নচিত্রের গূঢ়ভাব ঠিক তাহার বিপরীত।

পূর্বের উদ্ধৃত কবিতায় এমন কতকগুলি লোকের বর্ণনা আছে যাহারা দুর্গম পথের প্রান্তে পান্থশালায় অন্যান্য যাত্রীদলের সহিত যাত্রা করিবার জন্য একত্র হইয়াছিল কিন্তু যাত্রা করিবার মত উৎসাহ ও উদ্যম তাহাদের একেবারেই ছিল না, অলীক ভাবের আবেশে তন্দ্রাচ্ছন্নের ন্যায় তাহারা পড়িয়া ছিল। সেই মূঢ় মুগ্ধেরা অলস আত্ম-বিনোদনে এমনই বিভোর হইয়া ছিল যে, জাগ্রত উদ্যত বিশ্বযাত্রীদল কখন যে বিজয়শঙ্খ বাজাইয়া সুদূর অচলে যাত্রা করিয়া চলিয়া গেল তাহা তাহারা জানিতেও পারে নাই। ভগবানকে লাভ করিবার কঠিন সাধনার পথে চলিবার উৎসাহ বা প্রয়োজনবোধ তাহাদের নাই। শেষ ছত্রে বলা হইয়াছে তাহারা জীবনের

দীর্ঘ সময় ভগবানকে নিজের খেলনা রূপে ব্যবহার করিয়া খেলা করিয়া কাটাইয়াই জীবন সার্থক বলিয়া মনে করিতেছে।

দুর্গমপথযাত্রীদলের ঠিক বিপরীত প্রকৃতির লোক ইহারা। ইহাদের গতি অসীমপথে যাত্রা নয় এবং ইহাদের তাল খেলনা লইয়া খেলা মাত্র, এই ভাবটি প্রকাশের জন্যই যেন এখানে তাল, গান ও গতি ভিন্নরূপে সজ্জিত হইয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

"সবুজের অভিযান" কবিতাতেও এই দুই শ্রেণীর লোকের উল্লেখ আছে। একদল নিঃশঙ্ক, চিরতরুণ, অবসাদহীন, ক্ষুদ্র অহংএর বন্ধন হইতে মুক্ত এবং বৃহৎ অহংএর প্রেরণায় প্রমত্ত। কবি তাহাদের সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন,

ঝড়ের মাতন বিজয়কেতন নেড়ে,
অট্টহাস্যে আকাশখানা ফেড়ে,
ভোলানাথের ঝোলাঝুলি ঝেড়ে
ভুলগুলো সব আন্ রে বাছা বাছা।

এখানে প্রথমে ঝড়ের মাতনে ও বিজয়কেতনের আন্দোলনে তাল, অট্টহাস্যে গান এবং "ভোলানাথের ঝোলাঝুলি ঝেড়ে" "ভুলগুলি সব আন্ রে বাছা বাছা"তে গতির ইঙ্গিত রহিয়াছে। সবুজের অভিযান কবিতাতেই আবার আর একদলের বর্ণনা আছে, যাহারা

ঐ যে প্রবীণ, ঐ যে পরম পাকা,
চক্ষুকর্ণ দুটি ডানায় ঢাকা।
ঝিমায় যেন চিত্রপটে আঁকা
অন্ধকারে বন্ধ করা খাঁচায়।

বাহির পানে তাকায় না তো কেউ,
দেখে না যে বান ডেকেছে,
জোয়ার-জলে উঠছে প্রবল ঢেউ।

শেষ তিন ছত্রে ত্রয়ী পরিকল্পনা আছে। বাহিরপানে তাকানোতে গতির পরিকল্পনা রহিয়াছে, গতি এখানে প্রথমেই আছে। বান ডাকায় গান এবং জোয়ার-জলের ঢেউয়ে তাল সর্বশেষে রহিয়াছে। ইহার নিগূঢ়ভাব পূর্বে উদ্ধৃত স্তবকের নিগূঢ়ভাবের ঠিক বিপরীত।

"দুরন্ত আশা" কবিতার প্রথমার্ধের ত্রয়ী পরিকল্পনাময় কয় ছত্র এইরূপ ঃ

সন্তরিয়া মৃত্যু-স্রোতে
নৃত্যময় চিত্ত হ'তে
মত্ত হাসি টুটে ;
বিশ্বমাঝে মহান্ যাহা
সঙ্গী পরানের
ঝঞ্ঝা মাঝে ধায় সে প্রাণ
সিন্ধুমাঝে লুটে।

এই স্তবকে ত্রয়ী পরিকল্পনায় প্রথমে নৃত্যে তাল, তাহার পর হাসিতে গান এবং শেষে ঝঞ্ঝার ভিতর ধাবনে গতির ইঙ্গিত পাওয়া যাইতেছে, সুস্পষ্টভাবে তাল, গান ও গতি ঠিক পর পরই আছে।

এই "দুরন্ত আশা" কবিতারই শেষার্ধের কয়েকটি ছত্র ঃ

পাদুকা তলে পড়িয়া লুটি'
ঘৃণায় মাথা অন্ন খুঁটি

ব্যগ্র হয়ে ভরিয়া মুঠি
যেতেছ ফিরি ঘর ;
ঘরেতে বসে’ গর্ব কর
পূর্বপুরুষের,
আর্যতেজ দর্প-ভরে
পৃথ্বী থর থর ।

এই কয় ছত্রে প্রথমেই পাদুকাতল হইতে অন্ন খুঁটিয়া লওয়াতে গতির ইঙ্গিত, “ঘরেতে বসে গর্ব কর”তে গানের ইঙ্গিত এবং “দর্প-ভরে পৃথ্বী থর থর” সর্ব্বশেষে তালের ইঙ্গিত পাওয়া যাইতেছে। পূর্বের স্তবকে ছিল মহান আদর্শের প্রেরণায় শঙ্কাহীন সাহসের ছবি, আর পরের স্তবকে আছে দাসত্ব, নীচতা, ভীরুতা ও বৃথাগর্বের চিত্র : দেখা যাইতেছে, তাল, গান ও গতির পরিকল্পনা প্রথমটিতে যথাযথভাবে ও পরেরটিতে বিপরীতভাবে সাজানো হইয়াছে ; ইহাদের নিগূঢ়ভাব সম্বন্ধেও সেই কথাই বলা চলে, অর্থাৎ প্রথমটির ভিতর যে আদর্শ প্রস্ফুটিত হইয়াছে সেইটিই মানবজীবনের যথার্থ আদর্শ এবং দ্বিতীয়টি তাহার বিপরীত।

এইবার “অভিসার” কবিতা হইতে দুটি বিভিন্ন অংশ লইয়া আলোচনা করা যাক্। কবিতাটির গল্পাংশ এইরূপ : বাসবদত্তা নামে এক সুন্দরী নটী অভিসারে যাইতেছিল, পথে উপগুপ্ত নামক এক তরুণ সন্ন্যাসী শয়ন করিয়া নিদ্রা যাইতেছিলেন। অন্ধকার রাত্রি, সেজন্য বাসবদত্তা একটি আলো হাতে লইয়া যাইতেছিল। চলিবার সময় তাহার পা পথে নিদ্রিত

সন্ন্যাসীর গায়ে গিয়া পড়িল, বাসবদত্তা তাহার হাতের আলো সন্ন্যাসীর মুখের উপর ফেলিয়া দেখিতে পাইল যে এক পরম সুন্দর পুরুষ পথে শুইয়া আছেন। তখন তাহার মনে সন্ন্যাসীর সহিত মিলনের আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হইল, সে লজ্জাবিজড়িত কণ্ঠে সন্ন্যাসীকে নিজগৃহে নিমন্ত্রণ করিল। উপগুপ্তের ন্যায় একজন সাধুপুরুষের নিকট নটীর এই প্রস্তাব প্রকৃতির মধ্যে যেন একটা বিরুদ্ধভাব জাগাইয়া তুলিল ; কবি এইরূপে তাহার বর্ণনা দিয়াছেন :

সহসা ঝঞ্ঝা তড়িৎশিখায়
মেলিল বিপুল আস্য।
রমণী কাঁপিয়া উঠিল তরাসে,
প্রলয়-শঙ্খ বাজিল বাতাসে,
আকাশে বজ্র ঘোর পরিহাসে
হাসিল অট্টহাস্য।

ঝঞ্ঝা এখানে গতির ইঙ্গিত, রমণীর কম্পন তালের ইঙ্গিত, এবং সর্বশেষে অট্টহাস্যে গানের ইঙ্গিত। পাপপথে চলিতে গেলে প্রকৃতির মধ্যে একটা বিরুদ্ধতার উদ্ভব হয় এই ভাবটি এই কবিতায় প্রকাশ পাইতেছে, এবং তাল, গান ও গতির বিপর্যস্ত প্রকাশও এই বিরুদ্ধতার ইঙ্গিতস্বরূপ।

সন্ন্যাসী উপগুপ্ত এই অসংগত অনুরোধ শুনিয়া উত্তর দিলেন, "যখন সময় হইবে তখন তোমার কাছে যাইব।" ইহার কিছুদিন পরে বাসবদত্তা বসন্ত-রোগাক্রান্তা হইলে নগরপালের আদেশে তাহাকে নগরপ্রাচীরের বাহিরে মাঠের মধ্যে ফেলিয়া আসা

হইল। দারুণ রোগযন্ত্রণায় অভিভূতা বাসবদত্তা যখন একাকিনী অসহায়া অবস্থায় পড়িয়া আছে তখন সন্ন্যাসী উপগুপ্ত তাহার কাছে আসিলেন। কবি বর্ণনা করিয়াছেন,

ঝরিছে মুকুল, কূজিছে কোকিল,
যামিনী জ্যোছনামত্তা।
"কে এসেছ তুমি ওগো দয়াময়,"
শুধাইল নারী, সন্ন্যাসী কয়—
"আজি রজনীতে হয়েছে সময়
এসেছি বাসবদত্তা।"

এইটি "অভিসার" কবিতার শেষ স্তবক, ইহাতে পর পর তাল, গান ও গতির পরিকল্পনা যথাযথভাবে আছে, পূর্বোদ্ধৃত স্তবকের ন্যায় বিশৃঙ্খলভাবে নয়।

আদিম যুগে চিত্রকলা ভাবপ্রকাশের একটি প্রধান বাহন ছিল। Encyclopoedia of Religion and Ethics পুস্তকের দ্বাদশ ভাগে দেখিতে পাই, আদিম যুগের ছবিতে একটি সমকোণ ত্রিভূজের চূড়া উর্ধ্বদিকে থাকিলে তাহা অগ্নির দ্যোতক, ত্রিভুজটি উল্টা করিয়া আঁকা হইলে অর্থাৎ চূড়াটি নিম্নমুখী থাকিলে অগ্নির বিরুদ্ধধর্ম্মী জল বুঝাইত।

কথার উচ্চারণ বিপরীত হইলে অনেক সময় অর্থ ও ঠিক বিপরীত হয়, যেমন ইংরেজি care ও wreck এই দুইটি শব্দের উচ্চারণ উল্টা এবং অর্থও উল্টা—একটির অর্থ যত্ন করা, অপরটির অর্থ ধ্বংস করা।

সংস্কৃত ভাষায় অক্ষরের বা বানানের পরিবর্তনে শব্দের অর্থ একেবারে বিপরীত হইয়া গিয়াছে এরূপ দৃষ্টান্ত আছে :

শব্দ	অর্থ	শব্দ	অর্থ
সকল	সমগ্র	শকল	খণ্ড
রিক্ত	শূন্য	রিক্থ	ঐশ্বর্য
বর্জ্য	পরিত্যাগের যোগ্য	বর্য্য	প্রধান, শ্রেষ্ঠ
অসন	ত্যাগ	অশন	ভোজন, উদরস্থ করা
পুং	নরকবিশেষ	পূত	পবিত্র
ভান	প্রকাশ, দীপ্তি	ভাণ	অপ্রকৃত ভাব
জাত	উৎপন্ন	যাত	গত
ধাতৃ	বিধাতা Father Substitute	ধাত্রী	ধাইমা Mother Substitute

ছবির উল্টানোতে অর্থের বৈপরীত্যে, এবং শব্দের অক্ষর ও বানানের পরিবর্তনে অর্থের বৈপরীত্যে স্বপ্নচৈতন্যের ক্রিয়া আছে।

স্বপ্নে ছবির ইশারার ভিতর অর্থ থাকে, আদিমযুগে ছবির ইশারা দিয়া অর্থ বুঝানো হইত; অক্ষর ও বানানের চিহ্নগুলিও এক-একটি ছবি ভিন্ন আর কিছুই নয়। রবীন্দ্রনাথ এই ইশারা-জগতের অধিবাসী। প্রকৃতির ইশারার ভিতর দিয়া তিনি সীমার ভিতর অসীমের পরিচয় পাইয়াছেন, শত শত রূপের ভিতর দিয়া অরূপ তাঁহার নিকট ধরা দিতেছেন। কবিতা যেমন ইশারার খেলা, চিত্রকরের চিত্রও তাই। কবি "পঞ্চাশ বৎসরের কিশোর গুণী নন্দলাল বসুকে সত্তর বৎসরের প্রবীণ যুবা রবীন্দ্রনাথের আশীর্ভাষণে" বলিয়াছেন :

যে মায়াবিনী আলিম্পনা সবুজে নীলে লালে
কখনো আঁকে কখনো মোছে অসীম দেশে কালে,
মলিন মেঘে সন্ধ্যাকাশে
রঙিন উপহাসি যে হাসে,
রং-জাগানো সোনার কাঠি সেই ছোঁয়াল ভালে।
বিশ্ব সদা তোমার কাছে ইশারা করে কত,
তুমিও তারে ইশারা দাও আপন মনোমত।
বিধির সাথে কেমন ছলে
নীরবে তব আলাপ চলে,
সৃষ্টি বুঝি এমনিতর ইশারা অবিরত।

রবীন্দ্র-কাব্যে 'গতি'

গানই গতির প্রেরণাদাতা।

"নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গে" কিশোর কবি গাহিয়াছিলেন,

কেমনে পশিল গুহার আঁধারে
প্রভাত-পাখির গান,
না জানি কেন রে এতদিন পরে
জাগিয়া উঠিল প্রাণ।

জাগিয়া উঠেছে প্রাণ
ওরে, উথলি উঠেছে বারি—
প্রাণের বাসনা প্রাণের আবেগ
রুধিয়া রাখিতে নারি।

• • •

ভাঙ্, ভাঙ্, ভাঙ্, কারা
আঘাতে আঘাত কর্। [তাল]
ওরে, কী গান গেয়েছে পাখি, [গান]
এয়েছে রবির কর। [গতি]

গানের পালের হাওয়ায় গতি আরম্ভ হইয়াছে,

হাওয়া লাগে গানের পালে,
মাঝি আমার, বস হালে।
এবার ছাড়া পেলে বাঁচে
জীবনতরী ঢেউয়ে নাচে
এই বাতাসের তালে তালে।

গতি 'অকূলে' পাড়ি দেওয়া :

দুলুক তরী ঢেউয়ের পরে [তাল]
ওরে আমার জাগ্রত প্রাণ,
গাও রে আজি নিশীথ রাতে [গান]
অকূল পাড়ির আনন্দ-গান। [গতি]

গতি অবচেতন মনের এক 'ঘরছাড়া' রূপ :

মেঘের কোলে কোলে যায়রে চলে বকের পাঁতি।
ওরা, ঘরছাড়া মোর মনের কথা যায় বুঝি ঐ গাঁথি গাঁথি।
[তাল]

সুদূরের বীণার স্বরে [গান]
কে ওদের হৃদয় হরে,
দুরাশার দুঃসাহসে উদাস করে,
সে কোন্ উধাও হাওয়ার পাগলামিতে

পাখা ওদের ওঠে মাতি। [গতি]
ওদের ঘুম ছুটেছে ভয় টুটেছে একেবারে,
অলক্ষ্যেতে লক্ষ্য ওদের পিছনপানে তাকায় না রে।
যে বাসা ছিল জানা
সে ওদের দিল হানা,
না-জানার পথে ওদের নাই রে মানা,
দিনের শেষে দেখেছে কোন মনোহরণ আঁধার রাতি।

সুদূরের বীণার সুর উহাদের আকুল করিয়াছে, তাই উহারা দুরাশার দুঃসাহসে উদাসী হইয়া উধাও হাওয়ায় পাখা বিস্তার করিয়া দিয়াছে ; কেবল যে পাখা বিস্তার করিয়া উড়িয়া চলিয়াছে তাহা নয়, গতির আনন্দে উহাদের পাখা যেন মাতিয়া উঠিয়াছে।

এই "সুদূর" "অলক্ষ্য" "না-জানা" সব কথাগুলিই নির্দেশ করিতেছে সেই এক 'অদ্বৈতম্'। "যে বাসা ছিল জানা", নিজের ব্যক্তিগত অহং এর বন্ধন, "সে ওদের দিল হানা", ব্যক্তিগত অহং-এর আসক্তি এখন বন্ধনস্বরূপ মনে হইতেছে, তাই না-জানার পথে যাইবার আর কোনো বাধা নাই। আমাদের এই ব্যক্তিত্ব-সীমাবেষ্টিত জীবন, যাহা আমাদের নিকট অত্যন্ত পরিচিত, দিনের মত সুস্পষ্ট, ইহার অবসানে যে অজানার অন্ধকার রাত্রি রহিয়াছে তাহাই আজ চিত্ত আকর্ষণ করিতেছে।

গতি 'খেলা ভাঙার খেলা' :

আজ খেলাভাঙার খেলা খেল্‌বি আর,
সুখের বাসা ভেঙে ফেলবি আয়।

মিলন-মালার আজ বাঁধন তো টুটবে,
ফাগুন দিনের আজ স্বপন তো ছুটবে,
উধাও মনের পাখা মেলবি আয়।
অস্তগিরির ঐ শিখরচূড়ে
ঝড়ের মেঘের আজ ধ্বজা উড়ে,
কালবৈশাখীর হবে যে নাচন,
সাথে নাচুক তোর মরণ-বাঁচন, [তাল]
হাসি-কাঁদন পায়ে ঠেলবি আয়। [গান ও গতি]

কবি বলিয়াছেন,

এই খেলাভাঙার খেলা বীরের খেলা। বাঁধন ছিঁড়ে যে চলে যেতে পারল, পথিকের সঙ্গে বেরিয়ে পড়ল পথে, তারি জন্যে জয়ের মালা। পিছনে ফিরে ভাঙা খেলনার টুক্‌রো কুড়োতে গেল যে, সে কৃপণ ; তার খেলা পুরো হল না, খেলা তাকে মুক্তি দিল না, খেলা তাকে বেঁধে রাখলে। এবার তবে ধূলোর সঞ্চয় চুকিয়ে দিয়ে হাল্কা হয়ে বেরিয়ে পড়ো।—'নবীন'

'খেলা'র কথা কবির রচনায় অনেকস্থলেই আছে। 'খেলা' শব্দটির একটি নিগূঢ় অর্থ আছে। এখানে 'খেলাভাঙা' অর্থে ব্যক্তিগত অহংএর বেড়া ভাঙার ভাবই বুঝাইতেছে।

গতির ভিতরেই আছে সর্বনাশের আহ্বান, আবার সর্বপ্রাপ্তির অনন্ত আশা।

তবু বেয়ে তরী সব ঠেলে হ'তে হবে পার,
কানে নিয়ে নিখিলের হাহাকার,
শিরে লয়ে উন্মত্ত দুর্দিন,
চিত্তে নিয়ে আশা অন্তহীন।

কবি পথের গান গাহিয়া চলিয়াছেন,

পথটাকে আজ আপন করে নিয়ো রে,
গৃহ আঁধার হ'ল, প্রদীপ
নিবল শয়ন-শিয়রে।
ঝড় এসে তোর ঘর ভরেছে,
এবার যে তোর ভিত নড়েছে, [তাল]
শুনিস নি কি ডাক পড়েছে [গান]
নিরুদ্দেশের দেশে গো,
এবার যে ঐ এল সর্বনেশে গো ! [গতি]

চলার পথের আহ্বান :

তোমার পথের পরে এনেছে আহ্বান—
রুদ্রের ভৈরব গান।
দূর হ'তে দূরে
বাজে পথ শীর্ণ তীব্র দীর্ঘতান সুরে,
যেন পথহারা
কোন্ বৈরাগীর একতারা।

ভাঙিয়া পড়ুক ঝড়, জাগুক তুফান, [তাল]
নিঃশেষ হইয়া যাক নিখিলের যত বজ্রবাণ।
রাখো নিন্দাবাণী, রাখো আপন সাধুত্ব-অভিমান, [গান]
শুধু একমনে হও পার
এ প্রলয়-পারাবার। [গতি]

চলার গান :

ওরে পথিক, ধর্‌না চলার গান
বাজা রে একতারা,
এই খুসিতেই মেতে উঠুক প্রাণ—
নাইক কূল-কিনারা।

পায়ে পায়ে পথের ধারে ধারে [তাল]
কান্না-হাসির ফুল ফুটিয়ে যা রে [গান]
প্রাণ-বসন্তে তুই-যে দখিন হাওয়া
গৃহ-বাঁধনহারা। [গতি]

পথে পথেই সাধনা :

জোয়ার-ভাঁটার নিত্য চলাচল
তার এই আনাগোনা। [তাল]
আধেক হাসি আধেক চোখের জল
মোদের চেনা-শোনা। [গান]
তারে নিয়ে হ'ল না ঘর বাঁধা,
পথে পথেই নিত্য তারে সাধা,
এমনি করেই আসা-যাওয়ার ডোরে
প্রেমেরি জাল-বোনা। [গতি]

বিশ্বের গতি প্রবাহ :

চলেছে জোয়ার-ভাঁটা আলোকে আঁধারে—
আকাশ-পাথারে ;
চলেছে ফুলের দল নীরব চরণে
বরণে বরণে ; [তাল]
সহস্র ধারায় চলে অনন্ত জীবন-নির্ঝরিণী
মরণের বাজায়ে কিঙ্কিনী। [গান]
অজানার সুরে
চলিয়াছি দূর হ'তে দূরে,
মেতেছি পথের প্রেমে। [গতি]

বিশ্বের চলার রাগিণী :

ঘুর্ণাচক্রে ঘুরে ঘুরে মরে
স্তরে স্তরে

সূর্য চন্দ্র তারা যত

বুদ্বুদের মতো। [তাল]

হে ভৈরবী, ওগো বৈরাগিনী,

চলেছ যে নিরুদ্দেশ সেই চলা তোমার রাগিণী, [গান]

শব্দহীন সুর

অন্তহীন দূর—

তোমারে কি নিরন্তর দেয় সাড়া? [গান]

সর্বনাশা প্রেম তার নিত্য তাই তুমি ঘরছাড়া। [গতি]

বিশ্বে যদি গতি না থাকিত,

যদি মুহূর্তের তরে

ক্লান্তিভরে

দাঁড়াও থমকি,

তখনি চমকি

উচ্ছ্রিয়া উঠিবে বিশ্ব পুঞ্জ পুঞ্জ বস্তুর পর্বতে,

পঙ্গু, মূক, কবন্ধ, বধির, আঁধা,

স্থূলতনু ভয়ংকরী বাধা

সবারে ঠেকায়ে দিয়ে দাঁড়াইবে পথে ;

অণুতম পরমাণু আপনার ভারে

সঞ্চয়ের অচল বিকারে

বিদ্ধ হবে আকাশের মর্মমূলে।

গতির বেগেই আবরণরাশি ছিন্ন হইয়া পুরাতন নূতন হইয়া উঠিতেছে, মৃত্যুর ভিতর দিয়া নবজীবনের বিকাশ হইতেছে :

যখন চলিয়া যাই সে চলার বেগে

বিশ্বের আঘাত লেগে

আবরণ আপনি যে ছিন্ন হয়,

বেদনার বিচিত্র-সঞ্চয়

হ'তে থাকে ক্ষয়। [তাল]
পুণ্য হই সে চলার স্নানে,
চলার অমৃত পানে
নবীন যৌবন
বিকশিয়া ওঠে প্রতিক্ষণ। [গান]
ওগো, আমি যাত্রী তাই
চিরদিন সম্মুখের পানে চাই। [গতি]

এই কবিতায় ঘাতপ্রতিঘাতে আবরণ ছিন্ন হওয়ার মধ্যে একটি তাল রহিয়াছে, সেই তালে 'শান্তম্' স্থর ঝংকৃত হইতেছে। চলার স্নানে ও চলার অমৃতপানের ভিতর দিয়া নবযৌবনের প্রতিক্ষণ বিকাশে গান ও শিবম্ এবং চিরদিন সম্মুখের পানে যাত্রা করায় পূর্ণতা বা অদ্বৈতমের অভিমুখে গতি বুঝাইতেছে।

গতির এক অপূর্ব চিত্র সন্ধ্যারাগরঞ্জিত ঝিলামের তীরে বসিয়া কবি অঙ্কিত করিয়াছেন :

সহসা শুনিনু সেই ক্ষণে
সন্ধ্যার গগনে
শব্দের বিদ্যুৎছটা শূন্যের প্রান্তরে
মুহূর্তে ছুটিয়া গেল দূর হ'তে দূরে দূরান্তরে।

সন্ধ্যার আধ-অন্ধকারে যে হংসবলাকার শ্রেণী উড়িয়া যাইতেছিল তাহাদের পক্ষধ্বনিই এই শব্দের বিদ্যুৎছটা।

কবি বলিতেছেন,

হে হংসবলাকা
ঝঞ্ঝামদরসে মত্ত তোমাদের পাখা
রাশি রাশি আনন্দের অট্টহাসে
বিস্ময়ের জাগরণ তরঙ্গিয়া চলিল আকাশে।

এখানে 'ঝঞ্ঝামদরসে মত্ত' তাল, 'আনন্দের অট্টহাস' গান, এবং বিস্ময়ের জাগরণ তরঙ্গিত করিয়া আকাশে উড়িয়া যাওয়া গতি।

মনে হ'ল এ-পাখার বাণী
দিল আনি'
শুধু পলকের তরে
পুলকিত নিশ্চলের অন্তরে অন্তরে
বেগের আবেগ,
পর্বত চাহিল হ'তে বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ
তরুশ্রেণী চাহে পাখা মেলি
মাটির বন্ধন ফেলি'
ওই শব্দরেখা ধরে' চকিতে হইতে দিশাহারা,
আকাশের খুঁজিতে কিনারা।
এ সন্ধ্যার স্বপ্ন টুটে বেদনার ঢেউ উঠে জাগি
সুদূরের লাগি।

হংসবলাকার মত্ত পক্ষধ্বনি যেমন নিশ্চলের অন্তরেও বেগের আবেগ জাগাইয়াছিল, সেই পাখার আন্দোলনের শব্দে পর্বতও যেমন বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ হইতে চাহিয়াছিল, মাটিতে শিকড়ে জড়বদ্ধ তরুশ্রেণীও মাটির বন্ধন ফেলিয়া পাখা মেলিয়া আকাশে উড়িতে চাহিয়াছিল, মানবের জড়ভাবাপন্ন মনেও কি কোনো ক্ষণে কোনো মঙ্গলময় গান সেইরূপ বেগের আবেগ জাগায় না?

কবি তাঁহার অবচেতন মনের স্বপ্নময় অনুভূতিতে জড়প্রকৃতির এই বাহিরের স্তব্ধতার ভিতর অন্তর্লীন গতির আবেগ অনুভব

করিয়াছেন, হংসবলাকার পক্ষধ্বনি সন্ধ্যার অন্ধকারে তাঁহার সম্মুখে এক নূতন জগতের দৃশ্য উদ্‌ঘাটন করিয়া দিয়াছে যেখানে ধ্বনির অনুসরণ করিয়া গতি নিরুদ্দেশ যাত্রা করিয়াছে :

শুনিতেছি আমি এই নিঃশব্দের তলে
শূন্যে জলে স্থলে,
অমনি পাখার শব্দ উদ্দাম চঞ্চল।...

দেখিতেছি আমি আজি
এই গিরিরাজি,
এই বন চলিয়াছে উন্মুক্ত ডানায়
দ্বীপ হ'তে দ্বীপান্তরে অজানা হইতে অজানায়।

বাঁধন-ছেঁড়ার সাধন কবির তপস্যা

তীরের সহিত শত বন্ধনে আবদ্ধ তরণী সাগরের খোলা হাওয়ায় ভাসিয়া যাইবার স্বপ্ন দেখিতেছে, কিন্তু বাঁধন কাটাইবার তাহার সামর্থ্য কই? কবি অবচেতনে শুনিতেছেন নিখিল ভুবনে বাঁধন ছিঁড়িবার আহ্বান ধ্বনিত হইতেছে, সেই আহ্বানে বিশ্বজগৎ আত্মহারা হইয়া অন্তবিহীন সত্তার উৎসবে নিজের প্রাণের ধারা মিলাইবার জন্য ছুটিয়াছে, সেই প্রাণপ্রবাহের গতিবেগ কবির মনেও আসিয়া লাগিয়াছে, তিনি বলিতেছেন :

ওই শুনি আমি চলেছে আকাশে বাঁধন ছেঁড়ার রবে
নিখিল আত্মহারা।

ওই দেখি আমি অন্তবিহীন সত্তার উৎসবে
ছুটেছে প্রাণের ধারা।
সে ধারার বেগ লেগেছে আমার মনে
এ ধরণী হ'তে বিদায় নেবার ক্ষণে,
নিবায়ে ফেলিব ঘরের কোণের বাতি,
যাব অলক্ষ্যে সূর্য-তারার সাথী।

কবির একটি গানের ভিতর গতির ছবি :

প্রলয়-নাচন নাচলে যখন আপন ভুলে
হে নটরাজ,
জটার বাঁধন পড়ল খুলে। [তাল]
জাহ্নবী তাই মুক্তধারায় উন্মাদিনী দিশা হারায়—
সংগীতে তার তরঙ্গদল উঠ্‌লো ফুলে। [গান]
রবির আলো দেখা দিল আকাশপারে, [গান]
শুনিয়ে দিল অভয়বাণী ঘরছাড়ারে; [গান]
আপন সুরে আপনি মাতে, সাথী হ'ল আপন সাথে
সবহারা সে সব পেল তার কূলে কূলে। [গতি]

নটরাজের প্রলয়-নৃত্যে তাল ও শান্তম্, জাহ্নবীর আনন্দ সংগীত ও রবির আলোর অভয়বাণীতে শিবম্ ও গান,—"সবহারা সে সব পেল তার কূলে কূলে"তে ত্যাগের পথে গতির সার্থক সমাপ্তি স্বরূপ অদ্বৈতমের ইঙ্গিত প্রকাশ পাইতেছে।

তাল ও গানের ছন্দরূপের ন্যায় গতিরও ছন্দরূপ আছে, সেই ছন্দরূপের একটি দৃষ্টান্ত এখানে দিতেছি।

আঁধারে আলোর—
প্রত্যহের প্রাণলীলা সাদায় কালোয়,

ছায়ানাট্যে ক্ষণিকের নৃত্যচ্ছবি যায় লিখে লিখে
লুপ্ত হয় নিমিখে নিমিখে। [তাল]
কালের সে লুকাচুরি, তার মাঝে সংকল্প সে কার
প্রতিদিন করে মন্ত্রোচ্চার—
বলে অবিশ্রাম— [গান]
বুদ্ধের শরণ লইলাম। [গতি]

"বুদ্ধের শরণ লইলাম" এই সংকল্পই এখানে গতির রূপ ধারণ করিয়াছে—সেই একের শরণ লইবার পথে যাত্রাই গতি।

সকল পাওয়ার মাঝে না-পাওয়ার অভিসারে যাত্রা :

যাহা জানিবার কোনো কালে তার জেনেছি যে কোনো কিছু
কে তাহা বলিতে পারে,
সকল পাওয়ার মাঝে না পাওয়ার চলিয়াছি পিছু পিছু
অচেনার অভিসারে।
তবুও চিত্ত অহেতু আনন্দেতে
বিশ্ব-নৃত্যলীলায় উঠেছে মেতে [তাল]
সেই ছন্দেই মুক্তি আমার পাব, [গান]
মৃত্যুর পথে মৃত্যু এড়ায়ে যাব। [গতি]

গতির ভিতরেই পরিপূর্ণতা :

পথে চলা সেই তো তোমায় পাওয়া,
যাত্রাপথের আনন্দগান যে গাহে
তারি কণ্ঠে তোমারি গান গাওয়া।
চায় না সে জন পিছন পানে ফিরে,

বায় না তরী কেবল তীরে তীরে, [তাল]
তুফান তারে ডাকে অকূল নীরে [গান]
যার পরানে লাগল তোমার হাওয়া। [গতি]

এই কবিতাটিতেও তাল গান গতি আছে—তুফান তাল, অকূল নীরে আহ্বান গান, ও প্রাণে তোমার হাওয়া লাগা গতি।

গতি অশেষ :

জানি পথশেষে আছে পারাবার,
প্রতিখনে সেথা মেশে বারিধার—
নিমিষে নিমিষে তবু নিঃশেষে [তাল]
ছুটিছে পথিক তটিনী।
ছেড়ে দিয়ে দিয়ে এক ধ্রুবগান
ফিরে ফিরে আসে নব নব তান, [গান]
মরণে মরণে চকিত চরণে
ছুটে চলে প্রাণ-নটিনী। [গতি]

বিশ্বকবিও কবির অনন্ত পথে যাত্রার আনন্দগানে সুর মিলাইতেছেন, চন্দ্র-তারা-রবিও সেই সুরে সুর মিলাইতেছে :

ওরে মন,—
যাত্রার আনন্দগানে পূর্ণ আজি অনন্ত গগন ;
তোর রথে গান গায় বিশ্বকবি,
গান গায় চন্দ্র তারা রবি।

সেই একে সকল গতির সমাধান :

এই জগতের মাঝে একটি সাগর আছে
নিস্তব্ধ তাহার জলরাশি,
চারিদিক হ'তে সেথা অবিরাম, অবিশ্রাম
জীবনের স্রোত মিলে আসি।

সূর্য হ'তে ঝরে ধারা, চন্দ্র হ'তে ঝরে ধারা,
কোটি কোটি তারা হ'তে ঝরে, [তাল]
জগতের যত হাসি, যত গান, যত প্রাণ, [গান]
ভেসে আসে সেই স্রোতোভরে,
মেশে আসি সেই সিন্ধু পরে। [গতি]

রবীন্দ্র-কাব্যে তাল, গান ও গতির সংক্ষিপ্ত আলোচনা এখানে শেষ হইল।

এই প্রবন্ধে প্রধানতঃ মনস্তত্ত্বের দিক দিয়া রবীন্দ্রনাথের কবিতা আলোচিত হইয়াছে। কবির কবিতার অধিকাংশ স্থলে যে পর পর তাল, গান ও গতির পরিকল্পনা দেখা যায় তাহারই সূত্র ধরিয়া এই আলোচনা অনুসৃত হইয়াছে।

এই আলোচনার প্রধান বিষয়গুলি নিম্নে দেওয়া হইল।

১. কবির কবিতার সহিত স্বপ্নচৈতন্যের গভীর সংযোগ।

২. কবির কবিতায় পর পর তাল, গান ও গতি বিশেষ কোনো গূঢ়ভাবের প্রতীকরূপে স্বতঃস্ফূরিত হইয়াছে।

৩. এই গূঢ়ভাবের মর্মকথা কোনো কোনো স্থলে কবির ঈষৎগোচর আবার কোনো স্থানে একেবারে অগোচর।

৪. যে মর্মকথা বা **latent content** কবির সম্পূর্ণ অগোচর রহিয়া গিয়াছে সেইটিই সকল গূঢ় ভাবের উৎস স্বরূপ। সেটি হইতেছে উপনিষদের মহাবাণী "শান্তম্ শিবমদ্বৈতম্"।

৫. কবির জীবনে এই বাণীর বিশেষ প্রভাব। এই বাণীকে কেন্দ্র করিয়া কবির সমস্ত রচনা ও খণ্ডকবিতা একটি অখণ্ড তাৎপর্যে গ্রন্থিত হইয়া নব নব বিচিত্ররূপে ক্রমবিকশিত হইয়াছে।

৬. "সীমার মধ্যে অসীম" শান্তম্ শিবমদ্বৈতমেরই অঙ্গীভূত এবং প্রকাশ স্বরূপ। কবি তাঁহার গভীর মনে যে 'সীমার মধ্যে অসীমের' সুর ঝংকৃত হইতেছে তাহা অনুভব করিয়াছেন কিন্তু পর পর তাল, গান ও গতির সহিত সীমার মধ্যে অসীমের যে একান্ত সম্বন্ধ আছে এবং "শান্তম্ শিবমদ্বৈতম্" যে এই তাল গান ও গতিরূপ প্রতীকের ভিতর গূঢ় মর্মকথারূপে বিরাজিত তাহা কবির অগোচর।

৭. যাহা নিজে ধরিতে পারা যায় না অথচ যাহা বিচিত্র বহিঃপ্রকাশের উৎস স্বরূপ, তাহাই latent content বা গভীরতম মর্মকথা।

প্রধানতঃ এই বিষয়গুলিই এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়।

পরিশিষ্ট

ত্রয়ী পরিকল্পনার উদাহরণ রবীন্দ্রনাথের গল্প রচনার ভিতরও পাওয়া যায়।

আমলকীকুঞ্জের ফলভারপূর্ণ কম্পিত শাখাগুলির মধ্যে উত্তর-বায়ু সূর্যকিরণকে পাতায় পাতায় নৃত্য করাতে থাকে এবং সমস্ত দিন শীতের রৌদ্র এখানকার অবাধ প্রসারিত মাঠের উপরকার সুদূরতাকে একটি অনির্বচনীয় বাণীর দ্বারা ব্যাকুল ক'রে তোলে তখন এর ভিতর থেকে আর একটি গভীরতর আনন্দ-সাধনার স্মৃতি কি আমাদের হৃদয়ের মধ্যে ব্যাপ্ত হয়ে পড়ে না ?

আমলকীর গাছের পাতাগুলিকে ঝরঝরিয়ে দিয়ে বাতাস বয়ে যাচ্ছে, তার মধ্যে একটা আলস্যের সুর বাজছে। আর বৃষ্টিতে ধোওয়া রোদ্দুরটি যেন সরস্বতীর বীণার তারগুলো থেকে বেজে ওঠা গানের মতো সমস্ত আকাশ ছেয়ে ফেলছে।

আকাশের দীর্ঘনিঃশ্বাস বনে বনে হায় হায় ক'রে উঠল, পাতা পড়ছে ঝরে ঝরে। বসন্তের ভূমিকায় ঐ পাতাগুলি একদিন শাখায় শাখায় আগমনীর গানে তাল দিয়েছিল, তারাই আজ আবার পথের ধূলিকে ঢেকে দিল, পায়ে পায়ে প্রণাম করতে লাগল বিদায়-পথের পথিককে।

ফাল্গুনের ভরা সাজি থেকে যা কিছু ঝরে ঝরে পড়ছে কুড়িয়ে নেব বনের মর্মর, বকুলের গন্ধ, পলাশের রক্তিমা—আমার বাণীর সূত্রে সব গেঁথে গেঁথে দেব তার মণিবন্ধে। হয়তো আবার আর-বসন্তেও সেই আমার দেওয়া ভূষণ পরেই সে আসবে।"

খেলা শুরুও খেলা, খেলা ভাঙাও খেলা। মরণে-বাঁচনে হাতে হাতে ধরে' এই খেলার নাচন। এই খেলায় পুরোপুরি যোগ দাও— শুরুর সঙ্গে শেষের সঙ্গে সম্পূর্ণ মিলিয়ে নিয়ে জয়ধ্বনি ক'রে চলে যাও।"

কবির অমিল ছন্দের কবিতাতেও ত্রয়ী পরিকল্পনা দেখিতে পাওয়া যায় :

হঠাৎ ঝরঝরিয়ে উঠল হাওয়া
গাছের ডালে ডালে,
জানলাটা উঠল শব্দ ক'রে,
দরজার কাছের পর্দাটা
উড়ে বেড়াতে লাগল অস্থির হয়ে।
আমি বলে উঠলেম,—
"ওগো, আজ তোমার ঘরে তুমি এসেছ কি
মরণ-লোক থেকে।"

ভোরের আলোক আঁধারে
থেকে থেকে উঠছে কোকিলের ডাক—
যেন ক্ষণে ক্ষণে শব্দের আতসবাজি।
ছেঁড়া মেঘ ছড়িয়েছে আকাশে।

পর পর তাল, গান ও গতির পরিকল্পনায় কতকগুলি শ্রেণী বিভাগ করা যাইতে পারে, যেমন :

প্রাকৃতিক দৃশ্য বর্ণনা।
ব্যক্তিগত কার্যের বর্ণনা।
কাহিনী।
শিশুসম্বন্ধীয় কবিতা।
বর্ষার কবিতা, ঋতু-কবিতা প্রভৃতি।

কোনো কোনো কবিতায় ত্রয়ী পরিকল্পনা পর পর একাধিক বার আছে। বর্ষার কবিতায় প্রায়ই একাধিক বার ত্রয়ী পরিকল্পনা দেখিতে পাওয়া যায়। যেমন ঃ

ঝর ঝর বৃষ্টি কলরোলে
তালের পাতা মুখর করে তোলে,
উতল হাওয়া বেণুশাখায় লাগায় ধাঁধাঁ রে।
ছায়ার তলে তলে জলের ধারা ঐ
হের দলে দলে নাচে তাথৈ থৈ,
মন যে আমার পথহারানো সুরে
সকল আকাশ বেড়ায় ঘুরে ঘুরে।

বিজুলী তার বীণার তারে
আঘাত করে বারে বারে,
বুকের মাঝে বজ্র বাজে
কী মহাতানে।
পুঞ্জ পুঞ্জ ভাবে ভারে
নিবিড নীল অন্ধকারে
জড়াল যে অঙ্গ আমার
ছড়াল প্রাণে।
পাগল হাওয়া নৃত্যে মাতি
হ'ল আমার সাথের সাথী
অট্টহাসে ধায় কোথা সে...

বাদল বাউল বাজায় রে একতারা,
সারা বেলা ধরে ঝরে ঝর ঝর ধারা।
আমের বনে ধানের ক্ষেতে আপন তানে আপনি মেতে
নেচে নেচে হ'ল সারা।
ঘন জটার ঘটা ঘনায় আঁধার আকাশ মাঝে,
পাতায় পাতায় টুপুর টুপুর নূপুর মধুর বাজে,
ঘর-ছাড়ানো আকুল সুরে
উদাস হয়ে বেড়ায় ঘুরে
পূবে হাওয়া গৃহহারা।

শ্রাবণ-বরিষণ পার হয়ে
কী বাণী আসে ওই রয়ে রয়ে,
গোপন কেতকীর পরিমলে,
সিক্ত বকুলের বনতলে,
দূরের আঁখিজল বয়ে বয়ে
কি বাণী আসে ওই রয়ে রয়ে।
কবির হিয়াতলে ঘুরে ঘুরে
আঁচল ভরে লয় সুরে সুরে,
বিজনে বিরহীর কানে কানে
সজল মল্লার গানে গানে
কাহার নামখানি কয়ে কয়ে,
কী বাণী আসে ওই রয়ে রয়ে।

বর্ষার কবিতায় অনেক স্থানেই স্বপ্নচেতনার আবেশ বিজড়িত হইয়া আছে :

বাড়িছে বৃষ্টির বেগ, থেকে থেকে ডাকে মেঘ
ঝিল্লীরব পৃথিবী ব্যাপিয়া,
সেই ঘনঘোরা নিশি, স্বপ্নে জাগরণে মিশি
না জানি কেমন করে হিয়া।

বাদর ঝর ঝর গরজে মেঘ
পবন করে মাতামাতি,
শিথানে মাথা রাখি বিথান বেশ
স্বপনে কেটে যায় রাতি।

প্রাকৃতিক দৃশ্য বর্ণনার নিম্নোদ্ধৃত দৃষ্টান্ত দুইটিতে দুইবার করিয়া পর পর ত্রয়ী পরিকল্পনা আছে :

স্খলিয়া পড়িতেছিল নিঃশব্দে বিরলে
বিবশ বকুলগুলি, কোকিল কেবলি
অশ্রান্ত গাহিতেছিল, বিফল কাকলি
কাঁদিয়া ফিরিতেছিল বনান্তর ঘুরে
উদাসীন প্রতিধ্বনি ; ছায়ায় অদূরে
সরোবর প্রান্তদেশে ক্ষুদ্র নির্ঝরিণী
কলনৃত্যে বাজাইয়া মাণিক্য-কিঙ্কিণী
কল্লোলে মিশিতেছিল।

বেড়াক ভাসিয়া
রজনী-গন্ধার গন্ধ মদির লহরী
সমীর-হিল্লোলে ; স্বপ্নে বাজুক বাঁশরী

চন্দ্রালোক প্রান্ত হতে; তোমার অঞ্চল
বায়ুভরে উড়ে এসে পুলক-চঞ্চল
করুক আমার তনু, অনন্তের গীতি
বাজায়ে শিরার তন্ত্রে। ফাটুক হৃদয়
ভূমানন্দে ব্যাপ্ত হয়ে যাক বিশ্বময়
গানের তানের মত।

ব্যক্তিগত কার্যের বর্ণনায়ঃ

কলসী-কাঁকনে ঝলকি ঝলকি
ভোলায় রে দিকভ্রান্তে
দুটি বোন তারা হেসে যায় কেন
যায় যবে জল আন্‌তে।

সিংহদুয়ারে বাজিল বিষাণ
বন্দীরা ধরে সন্ধ্যার তান,
মন্ত্রণা-সভা হ'ল অবসান

অমনি রমণী কনকদণ্ড
আঘাত করিল ভূমে,
আঁধার হইয়া গেল সে ভবন
রাশি রাশি ধূপ-ধূমে;
বাজিয়া উঠিল শতেক শঙ্খ
হুলুকলরব সাথে,
প্রবেশ করিল বৃদ্ধ বিপ্র
ধান্যদূর্বা হাতে।

চপল ভঙ্গে লুটায়ে রঙ্গে
পিশাচীরা পিছে উঠিল হাসি,
ফেলি দিল ফুল মাথায় আমার

বাতাস যেতেছে বহি তুমি কেন রহি' রহি'
তারি মাঝে ফেল দীর্ঘশ্বাস,
সুদূরে বাজিছে বাঁশি, তুমি কেন ঢাল আসি
তারি মাঝে বিলাপ-উচ্ছ্বাস ?

শিশু সম্বন্ধীয় কবিতায় :

বাদলা যখন পড়বে ঝরে
রাতে শুয়ে ভাববি মোরে,
ঝরঝরানি গান গাব ঐ বনে।
জানলা দিয়ে মেঘের থেকে,
চমক মেরে যাব দেখে।

বাইরে কেবল জলের শব্দ
ঝুপ ঝুপ ঝুপ—
দস্যি ছেলে গল্প শুনে
একেবারে চুপ।
তারি সঙ্গে মনে পড়ে—
বাদলা দিনের গান—
"বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর
নদেয় এল বান।"

ঘুম যে কোথা ছোটে ওর—
বিছানাতে হুলুস্থুলু
কলরবের চোটে ওর।
খিল্‌খিলিয়ে হাসে শুধু—
পাড়া সুদ্ধ জাগিয়ে,
আড়ি করে পালাতে চায়

তাই তাই তাই তালি দিয়ে
দুলে দুলে নড়ে.
চুলগুলি সব কালো কালো
মুখে এসে পড়ে।
"চলি-চলি-পা-পা"
টলি টলি যায়।

ঢেউয়ের মধ্যে মাগো যারা থাকে—
তারা আমায় ডাকে, আমায় ডাকে।
বলে "আমরা কেবল করি গান,
সকাল থেকে সকল দিনমান"
তারা বলে, "কোন্ দেশে যে ভাই,
আমরা চলি ঠিকানা তার নাই।"

দুটি হাত তার ঘিরিয়া ঘিরিয়া
রাঙা চুড়ি কয়গাছি,
করতালি পেয়ে বেজে ওঠে তারা
কেঁপে ওঠে তারা নাচি।
মায়ের গলায় বাহু দুটি বেঁধে
কোলে এসে বসে মেয়ে।

"শান্তম্ শিবমদ্বৈতম্" মন্ত্র সম্বন্ধে কবির অভিমত

"শান্তম্ শিবমদ্বৈতম্" উপনিষদের একটি মন্ত্র। এই মন্ত্র কি ভাবে অবচেতনার ভিতর দিয়া কবির রচনায় তাল, গান ও গতির ভিতর মূর্তি পরিগ্রহ করিয়াছে আমরা এই গ্রন্থে তাহাই দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি। কবি বলিয়াছেন,

মোর সারাজীবনের অন্তরের অনির্বাণ বাণী
জ্বালায়ে রাখিয়া গেনু
সে আমার নিবেদন তোমাদের সবার সম্মুখে।

কবির এই অন্তরের অনির্বাণ বাণী তাঁহার কবিতায় তাঁহার অগোচরেই রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে তাঁহার ধ্যানের মন্ত্রে।

এই মন্ত্র সম্বন্ধে কবি শ্রীমতী নির্ঝরিণী সরকারকে ১৩১৫ সালে লিখিত একখানি পত্রে বলিয়াছেন :

কোনো কোনো লোক, ঈশ্বরকে ক্ষণে ক্ষণে স্মরণ করিয়ে দেবার জন্য এক একটি মন্ত্রকে আশ্রয় করে থাকেন। রামমোহন রায় সমস্ত চিত্তক্ষোভ থেকে নিজেকে উত্তীর্ণ করবার জন্য গায়ত্রী মন্ত্র অবলম্বন করেছিলেন—যখনি তাঁর মন কোনো কারণে চঞ্চল হত তখনি তিনি ঐ মন্ত্র মনে মনে স্মরণ করতেন এবং ক্ষুদ্র সংসারের সমস্ত বন্ধন এড়িয়ে মুক্তিক্ষেত্রে গিয়ে উপনীত হতেন। আমিও উপনিষদের কোনো কোনো শ্লোককে এইরূপ আশ্রয়ের মত অবলম্বন করে থাকি। এই রকম এক-একটি মন্ত্র তুফানের সময় হালের মতো কাজ করে।

—'দেশ' শারদীয়া সংখ্যা ১৩৪৮

১৩১৭ সালে লিখিত শ্রীমতী নির্ঝরিণী সরকারকে আর একখানি পত্রে উপনিষদের এই বিশেষ মন্ত্রটির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় :

মা, সংসারের নানা গোলমালের মাঝখানে মনকে শান্ত ও সুন্দর রাখা অত্যন্ত শক্ত সে কি আমি জানিনে?……কিন্তু কি করবে মা? যা কঠিন তাই সাধন

করতে হবে। এমন কোনো একটি মন্ত্রকে মনের মধ্যে অভ্যাস করে নেবে যেটি স্মরণ হবামাত্র মন এক মুহূর্তে সেই সবচেয়ে বড়ো জায়গায় গিয়ে ঠেকবে। মনকে ঈশ্বরের মধ্যে স্থির করবার জন্য রোজ খানিকটা করে সময় দিতে হয়—তাঁকে মনের অত্যন্ত কাছে করে একবার অনুভব করে নিতে হয়।... শান্তম্ শিবম্ অদ্বৈতম্—যিনি সমস্ত জগৎ জুড়ে অন্তরে বাহিরে চিরদিন আছেন তাঁকে চরম সত্য বলে জানলে সংসারের সমস্ত ক্ষোভের কারণগুলো মুহূর্তের মধ্যে অত্যন্ত ছোট হয়ে যায়।

১৩১৫ সালে নববর্ষের উৎসবে কবি তাঁহার অভিভাষণে বলিয়াছিলেন :

জগতের মধ্যে অদ্য দারুণ দুর্যোগের দুর্দিন উপস্থিত হইয়াছে—চারিদিকে যুদ্ধভেরী বাজিয়া উঠিয়াছে—বাণিজ্যরথ দুর্বলকে ধূলির সহিত দলন করিয়া ঘর্ঘর শব্দে চারিদিকে ধাবিত হইয়াছে—স্বার্থের ঝঞ্ঝাবায়ু প্রলয়গর্জনে চারিদিকে পাক খাইয়া ফিরিতেছে—হে বিধাতা, পৃথিবীর লোক আজ তোমার সিংহাসন শূন্য মনে করিতেছে, ধর্মকে অভ্যাসজনিত সংস্কারমাত্র মনে করিয়া নিশ্চিন্তচিত্তে যথেচ্ছাচারে প্রবৃত্ত হইয়াছে—হে শান্তং শিবমদ্বৈতম্ এই ঝঞ্ঝাবর্তে আমরা ক্ষুব্ধ হইব না।

১৩৪৭ সালে ৭ই পৌষে শান্তিনিকেতনে 'আরোগ্য' নামে রবীন্দ্রনাথের যে অভিভাষণ পঠিত হয় তাহাতে তিনি বলেন :

ঋষিবাক্যে যে পরম মন্ত্র একদিন আমরা পেয়েছিলেম সে হচ্ছে শান্তং শিবং অদ্বৈতম্—এক সত্যের মধ্যে সত্যের এই তিন রূপ বিধৃত। শান্তি এবং কল্যাণ সর্বমানবের মধ্যে ঐক্য—এই বাণীর তাৎপর্য মানুষকে তার সত্য পরিচয়ে উত্তীর্ণ করতে পারে, কারণ মানবের ধর্ম পরস্পর প্রীতির মিলন, ব্যবহারে কল্যাণ ও শান্তিকে অক্ষুণ্ণভাবে স্বীকার করা। আমি এই কামনা করি আমাদের পিতামহের মর্মস্থান থেকে উচ্চারিত এই বাণী আমাদের প্রত্যেকের ধ্যানমন্ত্র হবে জগতে শান্তির দৌত্য করতে প্রাণ।